ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প
লীলা মজুমদার

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

লীলা মজুমদার

(রবীন্দ্র পুরস্কার, ভারত সরকারের শিশু-সাহিত্য
পুরস্কার এবং দেশিকোত্তম উপাধি প্রাপ্তা)

নন্দিতা পাবলিশার্স

প্রাপ্তিস্থান ঃ বুকফ্রেণ্ড

৮/১/বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট।

কলিকাতা-৭০০০৭৩

Chotoder Shrestha Galpa
By—Lila Majumdar
Price—Rs. Fifteen,

দ্বিতীয় ও সংশোধিত সংস্করন,
ডিসেম্বর ১৯৮৮

প্রকাশক :
রবীন্দ্র নাথ চন্দ্র
নন্দিতা পাবলিশার্স
৮/১/বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরনে
অঞ্জন ঘোষ

মুদ্রাকর :—
অমর মুদ্রণ
ও
আরতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৯ডি/এইচ/ষোল, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলি-৬

মূল্য—১৫ টাকা

উৎসর্গ

আমার মণিদার, সুবিনয় রায়ের, স্মৃতিতে
আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এ বই
উৎসর্গ করলাম।

ইতি—
লীলা মজুমদার

ভূমিকা

আমার প্রথম বই 'বদ্যিনাথের বাড়ি' হয়তো ৪৫ বছর আগে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছিলেন। তার পর আরো অনেক বই নানা প্রকাশকের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই সব থেকে একটি করে গল্প আমি নিজে পছন্দ করে দিয়েছি। নানা স্বাদের নানা মেজাজের গল্প, মনের মধ্যে আপনি গড়ে উঠেছে। পাঠকদের ভালো লাগলেই সব লেখা সার্থক হবে।

ইতি

লীলা মজুমদার

সূচীপত্র

ঘোতন কোথায়

সকালে খুব দেরি করে উঠলাম। উঠেই গায়ের চাদরটা এক লাথি
মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তারই উপর দাঁড়ালাম। চটি খুঁজে পেলাম
না। খালি পায়ে স্নানের ঘরে গেলাম। দাঁত মাজলাম না, তাতে যে
সময়টুকু বাঁচলো সে সময়টা কলের মুখ টিপে ধরে পিচকিরির মতন
দেয়ালে-টেয়ালে জল ছিটোলাম। খানিকটা আবার বাবার তোয়ালের
উপরও পড়লো দেখলাম। তারপর চোখেমুখে জল দিয়ে, মুখহাত মুছে
সেটাকে তালগোল পাকিয়ে ঘরের কোণায় ছুঁড়ে মারলাম। তারপর
একমুখ জল ভরে নিয়ে, শোবার ঘরে গিয়ে জানলা দিয়ে নিচে রাস্তায়
একজন বুড়ো লোকের গায়ে পু—চ করে ফেলেই তাড়াতাড়ি সরে
গিয়ে চুলটাকে খুব যত্ন করে আঁচড়াতে লাগলাম।

ততোক্ষণে নিচের তলায় মহা শোরগোল লেগে গেছে। পিসিমা দুধের
বাটি নিয়ে বলছেন, 'ঘোতন কোথায়?' আর সব থেকে বিরক্ত লাগলো
শুনে যে মাস্টারমশাইও সেই সঙ্গে ম্যাও ধরেছেন, 'প্রশান্তকুমার কি আজ
পড়বে না?' ভীষণ রাগ হলো। জীবনে কি আমার কোনও শান্তি
নেই? এই সক্কাল বেলা থেকে সবাই মিলে পিছু নিয়েছে।

পিসিমাকে সিঁড়ির ওপর থেকে ডেকে বললাম, 'দুধ খাবো না।'
সিঁড়ির নিচে মাকে এসে বললাম, 'চটি পরা ছেড়ে দিয়েছি।' বসবার
ঘরে গিয়ে গলা নিচু করে মাস্টারমশাইকে বললাম, 'মা বলে দিয়েছেন,
আজ আমার পেট ব্যথা হয়েছে, আজ আমি পড়বো না।' তারপর
একেবারে তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, সারাটা সকাল রোয়াকে
রোদ্দুরে বসে-বসে পা দোলালাম আর রাস্তা দিয়ে যতো ছ্যাকরা গাড়ি
গেলো তার গাড়োয়ানদের ভ্যাংচালাম।

দশটা বাজতেই উঠে গিয়ে বই-টই কতক কতক গুছিয়ে, আর
কতক কতক খুঁজেই পাওয়া গেলো না বলে ফেলে রেখে, ঝুপঝুপ
করে একটু স্নান করে নিয়ে, খুব যত্ন করে চুলটা ফের আঁচড়ে নিয়ে

খাবার ঘরে গেলাম।

মা জলের গেলাস দিতে-দিতে বললেন, 'হ্যাঁরে, মাস্টারমশাই কখন গেলেন, শুনতে পেলাম না তো?'

আমি সত্যি করেই বললাম, 'সে ক-খ-ন চলে গেছেন কেবা তার খবর রাখে!'

ভাত কতক খেলাম, কতক চার পাশে ছড়ালাম, কতক পুষিকে দিলাম, আর কতক পাতে পড়ে রইলো! মাছটা খেলাম, ডাল খেলাম, আর ঝিঙে-বেগুন ইত্যাদি রাবিশগুলো সব ফেলে দিলাম। মা রান্নাঘর থেকে দেখতেও পেলেন না। ট্রামভাড়াটা পকেটে নিয়ে মাকে বললাম, 'মা, যাচ্ছি।' এই পর্যন্ত প্রায় রোজই যেমন হয় তেমনই হলো। অবিশ্যি মাস্টারমশাইয়ের ব্যাপারটা রোজ হয় না, তাই যদি হতো তাহলে বাবা-টাবাকে বলে মাস্টারমশাই এক মহাকাণ্ড বাধাতেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু এরপর থেকে সেদিন সব যেন কেমন অন্য রকম হয়ে গেলো। মনে আছে ট্রামে উঠে ডান দিকের একটা কোণা দেখে আরাম করে বসলাম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি আর খালি মনে হচ্ছে কে যেন আমাকে দেখছে। একবার ট্রামসুদ্ধ সবাইকে দেখে নিলাম, বুঝতে পারলাম না কে। তারপর আবার যেই বাইরে চোখ ফিরিয়েছি, আবার মনে হলো কে আমাকে এমন করে দেখছে যে আমার খুলি ভেদ করে ব্রেন পর্যন্ত দেখে ফেলেছে। তাইতে আমার ভারি ভাবনা হলো। এমনিতেই নানান আপদ, তার উপর আবার ব্রেনের ভিতর-কার কথাগুলো জেনে ফেললে তো আর রক্ষে নেই। কিছুতেই আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। আবার মাথা ঘুরিয়ে ট্রামের প্রত্যেকটি লোককে ভালো করে দেখলাম।

এবার লক্ষ্য করলাম ঠিক আমার সামনে কালো পোশাক পরা একটি অদ্ভুত লোক। তার মুখটা তিনকোণা মতন, মাথায় গাধার টুপির মতন কালো টুপি, গায়ে কালো পোশাক লাল-নীল-হলদে-সবুজ চক্‌ড়াবক্‌ড়া তারা-আঁকা, পায়ে শুঁড়ওয়ালা কালো জুতো, দুই হাঁটুর

মাঝে হাতে ঝুলছে একটা সন্দেহজনক কালো থলে।

এরকম লোক সচরাচর দেখা যায় না। অবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই ভীষণ চমকে উঠলাম। দেখলাম মাথায় টুপি নয়, চুলটাই কিরকম উঁচু হয়ে বাগিয়ে আছে। গায়ে সাধারণ ধুতির উপর কালো আলোয়ান, তাতে ট্রামের ছাদের কাছের রঙিন কাচের মধ্যে
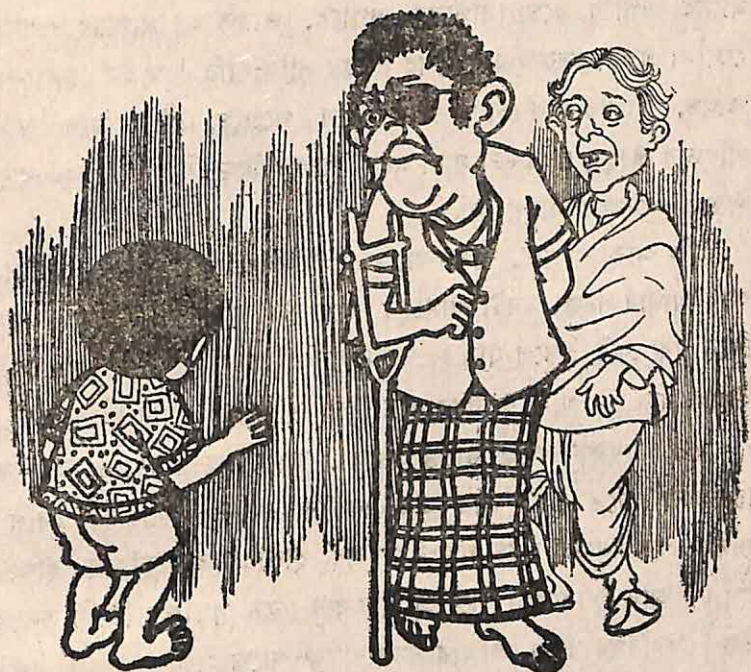
দিয়ে রঙবেরঙ হয়ে আলো পড়েছে। আর পায়ে নাকতোলা বিদ্যাসাগরী চটি। খালি হাতের থালিটা সেই রকমই আছে। কিরকম একটু ভয় ভয় করতে লাগলো।

লোকটা খুশি হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর স্পষ্ট গলায় বললো, 'অতই যদি খারাপ লাগে, ইস্কুলে যাও কেন? বড়রা যখন এতই অবুঝ তাদের কথা মেনে নাও কেন?'

আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিলো, জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে কি করবো?'

লোকটি বললে, 'কি করবে? তাকিয়ে দেখ নীল আকাশে ছোট-

ছোট সাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। গাছেরা সব ভিজে পাতায় সোনালী রঙের রোদ মেখে বসে আছে। গড়ের মাঠের ধার ঘেঁষে পুকুরটাকে ছাখো, ঘোর সবুজ জলে টলমল করছে। আর টের পাচ্ছো দখিন হাওয়া দিচ্ছে?' তারপর লোকটা তার বড়-বড় ফুটোওয়ালা নাকটা তুলে বাতাসে কি যেন শুঁকে বললো, 'হুঁ, পেঙ্গুইনের গন্ধ পাচ্ছি। গড়ের মাঠের ওপারে, বঙ্গোপসাগরের ওপারে, ভারত মহাসাগরের ওপারে, কোনো একটা বরফজমা দ্বীপের ওপর সারি-সারি পেঙ্গুইন চলাফেরা করছে, তাদের মুখে-চোখে রোদ এসে পড়েছে, ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে, দু-একটা সাদা নরম পালক উড়ে গিয়ে এখানে-ওখানে পড়ছে—দেখতে পাচ্ছো না?

কি আর বলবো, তখন আমি যেন স্পষ্ট ঐ সব দেখতে পেলাম আর আমার সমস্ত মনটা আনচান করে উঠলো। মনে হলো এমন দিনে কি কেউ ইস্কুলে যায়? এমন পৃথিবীতে কোনো দিনও কেউ ইস্কুলে যায়? আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে আরেকটু আস্তে-আস্তে বললো, 'জানো ভোর রাতে বড়-বড় চিংড়িমাছ ধরতে হয়, তার এক-একটার ওজন একসেরের বেশি। দুদিন ধরে সমুদ্রের নিচে দড়ি-বাঁধা সব হাঁড়ার মতন ডুবিয়ে রাখতে হয়। আর ভোরবেলা গিয়ে ঐ দড়ি ধরে টেনে হাঁড়াসুদ্ধ চিংড়ি তুলতে হয়। তারপর বাড়ি ফেরবার সময় আস্তে-আস্তে সকাল হয়। তুমি তো জানো যে পুব দিকে সূর্য ওঠে, কিন্তু একথা জানো কি যে পশ্চিম দিকের আকাশটা আগে লাল হয়, তারপর পুব দিকে সূর্য ওঠে? তারও পর পশ্চিম দিকের লাল রঙ মিলিয়ে যায়, আর সমস্ত আকাশটা ফিকে পোড়া ছাইয়ের মতন হয়ে যায়। তারাগুলোকে নিবে যেতে কখনো দেখেছো কি?'

আমার মনে হলো আমার নিশ্চয় এখানে কিছু বলা উচিত, কিন্তু আমার জিব দেখলাম শুকিয়ে কাঠের মতন হয়ে গেছে। কিছু আর বলা হলো না। খালি মনটা হুহু করতে লাগলো। সে লোকটা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'কি জন্য কলকাতায় পড়ে থাকো আর

ইস্কুলে যাও ? জানো রবিঠাকুর ইস্কুল পালিয়ে-পালিয়ে অত বড় কবি হয়েছিলেন। আর জানো, সাঁওতাল পরগণায় যখন মহুয়া গাছের ফল পাকে, তার গন্ধে জঙ্গলসুদ্ধ সব জিনিসে নেশা লেগে যায়। আর বনের ভাল্লুকগুলো মহুয়া খেয়ে-খেয়ে নেশায় বেহুঁশ হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকে। পরদিন সকালে কাঠুরেরা তাদের ঐরকমভাবে দেখতে পায়। তুমি জানতে যে মহুয়া ফল খেলে নেশায় ধরে ?' আমার তখন মনে হলো দিনের-পর-দিন ইস্কুলে গিয়ে আমি বৃথাই জীবন নষ্ট করছি। ঐ লোকটা নিশ্চয় কখনও ইস্কুলে যায়নি।

হঠাৎ দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে, আমার দিকে ফিরে অম্লান বদনে বললো, 'এসো।' এমন করে বললো যেন বহুক্ষণ থেকে ঐ রকম কথা ছিলো। ও-ও নামবে আর সেই সঙ্গে আমিও নামবো। আমি নামলাম। যদিও আমি জানতাম অচেনা লোক ডাকলে সঙ্গে যেতে নেই। যদিও দিনের-পর-দিন পিসিমা বলেছেন—দুষ্ট লোকেরা বলে, 'মণ্ডা খাবি ?' 'সার্কাস দেখবি ?' এই সব বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলে-দের ধরে নিয়ে গিয়ে হয় আসামের চা-বাগানে চালান দেয়, নয় ঘোর জঙ্গলে মা-কালীর কাছে ঘ্যাঁচ করে বলি দেয়।

তবুও আমি নামলাম। কারণ রোজ-রোজ ঐ ঘুম থেকে ওঠা, দাঁত মাজা, পড়া তৈরি করা, স্নান করে ভাত খাওয়া, ইস্কুলে যাওয়া, ইস্কুল থেকে সারাটা দিনমান নষ্ট করে বিকেলে আবার ফেরা, সেই খাওয়া, সেই শোয়া—ঐরকম দিনের-পর-দিন, মাসের-পর-মাস, বছরের-পর—বছর—যতদিন না অনিশ্চিত ভবিষ্যতে, কবে আমি বড় হয়ে ভালো চাকরি করে এই সব জিনিসের ভালো ফল দেখাবো—ও আর আমার সহ্য হচ্ছিল না।

বইগুলো ট্রামের কোণায় আমার জায়গায় পড়ে রইলো। আমি সেই লোকটার সঙ্গে নেমে গেলাম। তখন মোড়ের ঘড়িতে সাড়ে দশটা বেজেছে। সে আমাকে একটা চায়ের দোকানের ভিতর দিয়ে পিছন দিকের ছোটো একটা ঘরে নিয়ে গেলো। সেখানে আমাকে একটা টিনের চেয়ারে বসিয়ে কোথায় জানি চলে গেলো। একটু পরেই

সে আবার ফিরে এলো, সঙ্গে একটা একচোখো লোক, অন্য চোখটার গায়ে একটা সবুজ তাপ্পি মারা। একটা পা আছে, আরেকটা পা কাঠের তৈরি।

লোকটা আমার দিকে এক চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, 'কি হে ছোকরা, পড়াশুনোর উপর নাকি এমনি ঘেন্না ধরে গেছে যে একেবারে সে-সব ত্যাগ করে এসেছো ?' তার গলাটা এমন কর্কশ আর চেহারাটাও এমন বিশ্রী যে আমি সত্যি ভড়কে গেলাম।

কালো কাপড় পরা লোকটার দিকে তাকাতেই সে গ্রামোফোনের চাকতির মতো বলে যেতে লাগলো 'পড়াশুনো করে কি হবে ? জানো, আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে যেসব বিরাট-বিরাট নদী আছে তার ধারে-ধারে কুমীরেরা আর হিপোপটেমাসরা শুয়ে-শুয়ে দিন কাটায় আর লম্বা লাল ঠ্যাং-এ ভর দিয়ে গোলাপী রঙের ফল্যামিঙ্গো পাখিরা রোদ পোয়ায় ? আর ঐ সব জঙ্গলের মধ্যে এমন বিশাল-বিশাল অরকিড জাতের ফুল ফোটে যে তার মধ্যে একটা মানুষ দিব্যি আরামে শুয়ে থাকতে পারে !' বুঝতে পারছিলাম এ লোকটা যাদু জানে। কারণ তক্ষুনি আমার ভয়-টয় কোথায় উড়ে গেলো। অন্য লোকটাকে জোর গলায় বললাম, 'হ্যাঁ, সে-সব চিরদিনের মতো ত্যাগ করে এসেছি।' লোকটা হাসলো, বললো, 'চিরদিন বড়ো দীর্ঘকাল হে ছোকরা। চিরদিনের কথা কে বলতে পারে ? কিন্তু তোমার সাহস আছে, উৎসাহ আছে, তুমি অনেক কিছু করতে পারবে। স্বাস্থ্যটাও তো ভালো দেখছি। আশা করি বাড়ির জন্য মনের টান ইত্যাদি কোনো দুর্বলতা নেই ?' হঠাৎ মনে হলো মা এতক্ষণে স্নানের যোগাড় করেছেন, বাবা আপিসে গেছেন এবং দু'জনেই মনে ভাবছেন আমি বুঝি ইস্কুলে গেছি। গলার কাছটা সবে একটু ব্যথা করতে শুরু করেছিলো, এমন সময় কালো কাপড় পরা লোকটা বললো, 'ইস্কুলের বাইরে, বাড়ির বাইরে, কলকাতা থেকে বহু দূরে নরওয়ের উত্তরে চাঁদনি রাতে হারপুন দিয়ে তিমি শিকার হয়। তিমির গায়ে হারপুন বিধলে তিমি এমনি ল্যাজ আছড়ায় যে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে যায়। কত নৌকো ডুবে যায়।

আবার তিমি মরে গিয়ে যখন উলটে গিয়ে ভেসে ওঠে, দেখবে তার বুকের রঙটা পিঠের চেয়ে ফিকে। আর, জানো ইংল্যাণ্ডে শীতকালে সোয়ালো পাখিরা থাকে না। তারা দলে-দলে উড়ে স্পেনে চলে যায়, আর যেই শীত কমে আসে আবার তারা দলে দলে সমুদ্রের উপর দিয়ে অবিশ্রান্ত গতিতে উড়ে ফিরে আসে। এসে দেখে তাদের আগেই শীতের বাতাসকে তুচ্ছ করে ড্যাফোডিল ফুলরা ফুটে গেছে।' আমার মন পাখির মতন উড়ে যেতে চাচ্ছিলো।

একচোখো বললো, 'কিন্তু শুধু তিমি মারলে হবে না। তার বহু অসুবিধাও আছে, বহু দূরও। এই কাছাকাছি মানুষ-টানুষ মারতে পারবে? পরে যাবে আফ্রিকা, নরওয়ে, আলাস্কা—আপাতত অন্ধকার রাত্রে গলির মুখে দাঁড়িয়ে বাঁকা ছুরি হাতে নিয়ে ঘচ্ করে সেটাকে লোকের বুকে আমূল বসিয়ে দিতে পারবে? যেমন রক্তের নদী ছুটবে তুমিও হে-হো করে রাত কাঁপিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে উঠবে? মাথায় বাঁধা থাকবে লাল রুমাল?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সেই কালো কাপড় পরা লোকটা বললো, 'উত্তর মেরুতে সীল মাছেরা বরফের মধ্যে বাস করে—'

আমি বললাম, 'কুড়ি বছর পরে উত্তর-মেরুর কথা শুনবো, এখন আমি ইস্কুলেই বরং যাই, মাথায় আমি লাল রুমাল কিছুতেই বাঁধতে পারবো না।'

লোকটা বললো, 'কে জানে ভুল করছো কি না?'

আমি ততক্ষণ চায়ের দোকানের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে ট্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। প্রথম যে ট্রাম এলো তাতেই উঠে পড়লাম। উঠেই ভীষণ চমকে গেলাম। দেখলাম ট্রামের কোণায় ডানদিকের সিটে আমার বইগুলো পড়ে রয়েছে। কেমন করে হলো বুঝতে না পেরে ফুটপাথে চায়ের দোকানের সামনে কালো কাপড় পরা লোকটার দিকে তাকালাম।

আবার মনে হলো তার মাথায় গাথার টুপির মতো টুপি, গায়ের কালো পোশাকে রঙবেরঙের চক্ড়াবক্ড়া আঁকা, আর পায়ে শুঁড়তোলা

কালো যাদুকরের জুতো।

সে আমাকে হাত তুলে ইশারা করে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লো। আর আমি মোড়ের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তখনও সাড়ে দশটা বেজে রয়েছে!

পেয়ারা গাছের নীচে

বুড়ো দাদু আর মনুয়া দিনভর পেয়ারা গাছতলায় বসে থাকে। শীত এসে যায়, পেয়ারা গাছের পাতা বড়ো কম, ডালের মাঝখান দিয়ে রোদ ওদের গায়ে পড়ে, ডালপালার আঁকাবাঁকা ছায়া ওদের গায়ে পড়ে। সেই ছায়ার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ওপর দিকে চেয়ে মনুয়া দেখে আকাশের নীল গায়েও ঐরকম ডালপালা সাদা রং দিয়ে আঁকা। মনুয়া একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'বুড়ো দাদু, কাল আমার জন্মদিন, আমার বন্ধু কাঁকরকে তাই নেমন্তন্ন।'

বুড়ো দাদু নীল আকাশ যেখানে নীল বনের পেছনে ডুবে গেছে সেদিকে চেয়ে বলেন, 'কাল আমারও জন্মদিন, আমার বন্ধুদেরও নেমন্তন্ন করতে হবে।'

মনুয়া বলে, 'কারা তোমার বন্ধু, বুড়ো দাদু? তাদের চিঠি দিতে হবে? মা কাল কিসমিস দিয়ে পায়েস রাঁধবে।'

বুড়ো দাদু আরাম কেদারার তলা থেকে ছোট্ট টিনের হাতবাক্স বের করে কাগজপত্র ঘেঁটে বলেন, 'কি জানি, তাদের নাম তো মনে পড়ছে না। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি যে কোপাই নদীতে চান করতে যেতাম, তাদের বললে যে তারা মনে দুঃখ পাবে।'

মনুয়া উঠে এসে বলে, 'দাও তো দেখি তোমার হাতবাক্স, আমি খুজে দেখি তাদের নাম-ঠিকানা পাই কি না।'

কিন্তু বুড়ো দাদু কিছুতেই বাক্স দেবেন না। বলেন, 'নারে মনুয়া,

তোর বাবাকে, নাকি তার বাবাকে কাকে যেন একবার দিয়েছিলাম, সে ঘেঁটে-ঘুঁটে তছনছ করে দিয়েছিলো। পরে রসিদ খুঁজে পাওয়া যায় নি। তুই বরং অন্য কোথাও খুঁজে দেখিস?'

'তা হলে মাকে ক'জনার জন্যে পায়েস রাঁধতে বলব, বুড়ো দাদু?'

বল গে পাঁচজনার জন্যে।—নারে, দাঁড়া, যে আমার নতুন চটি কোপাইয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলো তাকে বলে কাজ নেই। তার নষ্টামির আর শেষ নেই। কি জানি তোদের এসব ফুলগাছটাছ যদি ছিঁড়ে মাড়িয়ে একাকার করে। ওকে বাদ দিলেই ভালো।'

'বেশ, তা হলে বলি চারজন?'

'না রে, দাঁড়া দাঁড়া। ঐ যার কটা চোখ, সে ভারি ঝগড়ুটে রে মনুয়া। শেষটা যদি তোর বন্ধু কাঁকরের সঙ্গে মারপিট করে। ওকেও না বলাই ভালো।'

'তবে কি তিন জনকে বলা হবে, বুড়ো দাদু?'

বুড়ো দাদু অবাক হয়ে বলেন, 'তিনজন আবার কোথায় পেলি মনুয়া? গয়লাবাড়ির ওপারে যে থাকে, গয়লাদের কাছ থেকে চুরি করে মাখন খেয়ে খেয়ে তার যে শরীরের আর কিছু নেই। অতো পায়েস তার সইবে কেন? ওর নামটাও কেটে দে।'

মনুয়া বলল, 'তা হলে আমার বন্ধু কাঁকর আর কাঁকরের ছোট ভাই উদো আসবে। আর তোমার বন্ধু দু'জন তো? যাই মাকে বলে আসি গে।' বুড়ো দাদু তাই শুনে মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 'কি জ্বালা! অত তাড়াটা তোর কিসের শুনি, ঐ দু'জনের এক জনের মুখে সারাক্ষণ মন্দ কথা লেগেই আছে, সে-সব শুনে যদি তোরা শিখে ফেলিস, থাক ওকে না বলাই ভাল।

মনুয়া বুড়ো দাদুর কাছ ঘেষে এসে বলে, 'তবে কি মোটে এক জনকে বলবো?'

বুড়ো দাদু এদিকে-ওদিকে, বাগানের চারদিকে, দূরে পাকড়াশিদের বাঁশঝাড়ের দিকে ও আমতালির পথের দিকে চেয়ে বলেন, 'আবার একজন কোথায় পেলি রে মনুয়া? আমাকে সুদ্ধু নিয়ে বলেছিলাম

পাঁচজন।'

মনুয়া বুড়ো দাদুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে, 'তবে কি তোমার বন্ধুরা কেউ আসবে না?'

বুড়ো দাদু শুনে অবাক হন।

'কেউ আসবেনা কিরে? ওরা কজনাই শুধু আসবে না, আর তো সবাই থাকবে। কাঁকর, কাঁকরের ভাই উদো, তুই, তোর মা, বাবা, কাকা, পিসি, তাদের বাবা, ভুলো। ভুলোকে ভুলিস নে যেন, নেড়ি-কুত্তা হলে কি হবে, কি গায়ের জোর ভুলোর। ও হয়ত একটু বেশিই খাবে। কিন্তু—'

মনুয়া বুড়ো দাদুর পায়ে হাত বুলিয়ে বলে, 'কিন্তু কি বুড়ো দাদু?' 'আমি তোকে কি দেবো, দে তো দেখি আমার হাত বাক্সটা। বল কি চাস, গয়না চাস?'

'গয়না তুমি কোথায় পাবে বুড়ো দাদু?'

'কেন? আমার ঠাকুরমার কতো গয়না ছিলো। ডাকাতের সর্দার ছিলেন আমার ঠাকুরমার বাবা। তার ভয়ে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। সন্ধ্যের পর ভয়ে কেউ পথে বেরোত না, বেরোলেই তাদের মেরে-কেটে, গয়নাগাঁটি যা ছিল কেড়েকুড়ে-ওকি মনুয়া, মুখ ঢাকছিস কেন? আচ্ছা, আচ্ছা, গয়নাগাঁটি না-ই নিলি। তাছাড়া সে সব নেইও। মোহর নিবি? থোলে থোলে সোনার মোহর? একটাও ডাকাতি করে পাওয়া নয়। রাজা ছিলো রে আমার ঠাকুরদা। ওদের বাড়িতে সবাই দুধে চান করতো, সোনার খাটে বসে রুপোর খাটে পা রাখত, তকমাপরা দাস-দাসীরা সোনা-বাঁধানো চামর দোলাতো।'

মনুয়া বলল, 'কোথায় পেতো থোলে থোলে সোনার মোহর ওরা?'

বুড়ো দাদু হেসে বললেন 'ওমা তাও জানিসনে বুঝি, প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হতো যে, না দিয়ে সব যাবে কোথা! ধান কেটে ঘর জ্বালিয়ে—' ও কি মনুয়া, কাঁদছিস নাকি? আচ্ছা, মোহর না-ই নিলি, সে সব হয়তো খরচও হয়ে গেছে এদ্দিনে। তুই বরং এই মোটা কাচের কাগজ-চাপাটা নে।' বুড়ো দাদু মোটা কাচের কাগজ-

চাপা উঁচু করে তুলে ধরেন। বুড়ো দাদুর পায়ের কাছে মাদুরে শুয়ে মনুয়া সেই কাচের মধ্যে দিয়ে ঘন নীল আকাশ দেখতে পায়, কাচের ওপর রোদ পড়ে; ধার দিয়ে রামধনুর রং ছিটোয়। রামধনুর রং এসে বুড়ো দাদুর গায়ে মনুয়ার গায়ে বেগুনি, নীল, কমলা, লাল রঙের আঁকাবাঁকা ডালপালার ছায়া ওদের গায়ে এসে পড়ে।

মা এসে বাটি করে ওদের জন্যে গরম দুধ, পাউরুটি আর নরম নরম লাল চিনি দিয়ে যান। বলেন, 'ও মনুয়া, কাল তোর জন্মদিনে কাঁকরদের নেমন্তন্ন করে আসিস।'

মনুয়া বলে, 'কাল বুড়ো দাদুরও জন্মদিন। বুড়ো দাদুও কাঁকরদের নেমন্তন্ন করবে।'

নোকো

আগেই বলে রাখি সুখ-শান্তিতে আমি বিশ্বাস করি না। তাই বলি, বেড়ে কাটল ঈস্টারের ছুটিটা। গ্র্যাণ্ড কর্ডে নোকো বলে একটা ছোট স্টেশন; ঠিক স্টেশনও নয়, বরং একটা গুমটি বলা চলে। দরকার হলে সেখানে গাড়ি থামাতে পারে। অমনি হুড়মুড় করে নেমে পড়তে হয়; এক মিনিটের মধ্যেই আবার ট্রেন চলতে শুরু করে। তাই বলে অবশ্যি সত্যি করে নোকো বলে গুমটিও নেই। তার অন্য নাম, বদলে দিলাম! গুড ফ্রাইডের দিন ভোরে সেখানে নামা। গুপি আর আমি। আগের দিন ছোটমামার তার পেয়েছিলাম, 'কাম শার্প'। দেখি গুমটিতে ছোটমামা নিজে দাঁড়িয়ে। নাকি সত্যিকার ছুটিতে এসেছেন। গুপি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'আমাদের কেন আনিয়েছ বলে ফেল চটপট।' ছোটমামা আকাশ থেকে পড়লেন। 'কেন আনিয়েছি আবার কি? ভালো জায়গায় একটু ছুটি কাটাবি, এটুকু তো আমার কর্তব্য।' তার-পর গুপির দিকে আড়চোখে চেয়ে বললেন, 'পুকুরে বড় বড় মাছ কিল-বিল করছে, বাড়িতে রোজ ভোরে একশো দশটা মুরগিতে ঘুম ভাঙায়।

দুধের ক্ষীর, মর্ত্যমান কলা। আর উন-গুরু তো দেবতা বিশেষ, কি তাঁর চেহারা, কি তাঁর কথাবার্তা!'

আমি বললাম, 'উন-গুরু কি?' ছোটমামা অবাক হলেন, 'আরে তাও জানিস্ না? আমার স্যারের গিন্নির গুরু। অর্থাৎ উনগুরু পুরো গুরু নন্। চল্ না, নিজের চোখে দেখবি।'

বাস্তবিকই দেখবার মতো। মাথায় ছ-ফুট উঁচু, চওড়াতেও প্রায় তাই, টকটকে গায়ের রঙ, গম-গম করে গলার স্বর, চোখে গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিণের মতো কালো চশমা। আমাদের দেখে আনন্দ রাখার যেন জায়গা পান না। এখানে বস্, ওখানে বস্, এখানে পা রাখ, এটা খাস্, ওটা খাস্, সাত সতেরো, যেন ওঁর বাপের ঠাকুরদা এসেছি আমরা। কলা, খোয়া ক্ষীরের লুচি, ছানার মুড়কি, চিনা বাদামের তক্তি ইত্যাদি দিয়ে জলখাবার খেয়ে উঠলাম স্নান করতে। কি কি বললেন উনগুরু, আগে নাকি নদীর পুলিসে চাকরি করতেন, লোমহর্ষক সব অভিজ্ঞতা, ঐ করেই জীবন কেটেছে। এখন অবসর নিয়ে খেত-খামার আর ভগবানের নাম করেন, অঢেল শান্তি উপভোগ করেন। হেসে বললেন, 'গাছপালার মজা কি জিনিস, একবার পুঁতে দিলেই শেকড় গজায়। উঃফ, সারা জীবন জল-ঝড়ে বাঘা পালোয়ানের পেছন পেছন ঘুরে হাঁটতে গেঁটো বাত ধরে গিয়েছিল রে, তবু ব্যাটাকে ধরতে পরিনি। আমার সব মৎলব পাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়ে যেত, এমনি চালাক! সে যাক্ গে।'

বাড়ির পেছনে আম কাঁঠালের বাঁগান, বাঁশঝাড়, কলাগাছ তার পরেই টলটলে নীল জলে ভরা পুকুর। শিরশির করে বাতাস বইছিল, তিরতির করে, ছোট ছোট ঢেউ উঠছিল। তারি মাঝে মাঝে দেখলাম এই বড় রুই-কাৎলা ঘাই দিচ্ছে। পুকুরের বাঁধানো ঘাট বেয়ে যেই না জলে নামলাম, পা ঘেঁষে সাঁতরে গেল মাছের পাল।

ছোটমামা বললেন মাঝে মাঝে নাকি কামড়ায় টামড়ায় পর্যন্ত। তাই উনি জলেটলে নামেন না।

এই বলে লিকলিকে শরীর নিয়ে দুটো ডন-বৈঠক করে নিলেন।

তুপুরের খাওয়াটাকে তো আর অসম্মান করা যায় না! বললাম, 'কে রাঁধে? গুরুমা নাকি?' ছোটমামা হেসেই সারা, 'আরে দূর দূর, ধার্মিক মানুষ, ব্যাচেলর, তাছাড়া মেয়েরা অমন ভালো রাঁধে নাকি? পৃথিবীর সব বড় সেফরা পুরুষমানুষ, তাও জানিস্ না? বহুদিন আছে এখানে, উন-গুরুর নিজের হাতে শেখানো। দেখিস খেয়ে। নাম প্যালা।'

বাস্তবিকই তাই। বুঝলাম ছুটিটা কাটবে ভালো। গুপিকে বললামও তাই। গুপি নাক সিটকে বলল, 'কোথাও নিশ্চয় ক্যাচ আছে রে, ছোটমামা এমনি এমনি ডেকে এনেছে বিশ্বাস হয় না।' যা বলেছিল ঠিক তাই। সবে ভাবছি ছিপ নিয়ে একটু বেরুব, এমন সময় ডাক এল। উনগুরু বললেন, 'একটা চোখ বাঘা নিয়েছিল, একটাকে নিয়েছে বয়সে। আবছা দেখি, খবরের কাগজ পড়তে পারিনে। পড়ে শোনা দিকি বাপ, পালা করে তুজনে।'

একটু বিরক্ত হয়ে মোড়ায় বসে পড়ে বললাম, 'কোন জায়গাটা পড়ব? এই খানটায়—সুন্দরবনে বিখ্যাত বিজন বাউলের মৃত্যু?'

'আহা সব পড়বি, সব পড়বি, প্রথম পাতার প্রথম লাইন থেকে শেষ পাতার শেষ লাইন অবধি। কি যেন বললি একটা, বিজন বাউলের মৃত্যু? বলিস্ কিরে! তা হলে তো—' এই বলে উন-গুরুদেব এতক্ষণ চুপ করে রইলেন যে শেষটা না বলে পারলাম না, 'কি হল? বলুন না বিজন বাউলের কথা।' পানু বলল, 'আর বাঘা পালোয়ানের কথা।' চমকে উঠলেন বুড়ো, 'ঐ, ঐ একই। বাউলের গল্পে আর বাঘার গল্পে কোনো তফাৎ নেই। এক দিক দিয়ে বলতে পারিস্ সেটা আমারো গল্প। যা মাছ ধর গে যা, কাগজ পড়তে হবে না।'

এদিকে আমরা তো কিছুতেই যেতে চাই না, 'না, না বলতেই হবে। সমস্ত কাগজটা পড়ে শোনাচ্ছি। রোজ শোনাব।'

গুরুদেব অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'বলব: কি রে। এই ভর তুপুরে সে-সব কথা বলা যায় কখনো? দেখছিস্ না, নাম করতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

চেয়ে দেখি বাস্তবিকই তাই। 'তা হলে কখন বলবেন?' গাওয়া ঘি দিয়ে রান্না প্যালারামের সেই রুই মাছের মইনুর সব চেয়ে বড় দেখে পাঁচ টুকরো খেয়ে হয়তো মেজাজটা তাঁর ভালোই ছিল। বললেন, 'আজ রাতে খাবার আগে। এখন পালা দিকিনি। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে দেখছি।' ফ্যাসাদটা আমরা না আর কিছু, সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

ও-রকম বাড়ি আমি জন্মে দেখি নি। লম্বা একটানা, নিচু টালির চাল, তার উপরে খড় বিছানো, খাসা দেখতে। চারদিকে ঘিরে চওড়া বারান্দা, তাতে আরাম কেদারা পাতা। ছাদ থেকে জালের ঝুড়িতে পাতা বাহারের গাছ ঝুলছে। উঁচু টিলার ওপর বাড়ি, চারদিকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। টিলার গায়ে তরকারি আর ফল-ফুলের গাছ; নিচে আমবাগান, পুকুর, গোয়াল, মুরগির ঘর। আছেন বেশ। সারাদিন আমরা দুজনে ঘুরে বেড়ালাম আর ছোটমামা টেনে ঘুম লাগালেন। সাড়ে চারটের সময় প্যালা একটা শিঙ্গা বাজিয়ে আমাদের ডাক দিল। কি বলব, ঐ নির্জন জায়গাতে শিঙ্গার শব্দ শুনে গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। গুরুদেবের জমির চৌহদ্দি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। তার বাইরে মাইলের পর মাইল ঘন বন। শাল, পলাশ, মহুয়া, সীতাহার, দেবদারু। বনের বুক চিরে একটা পাকা রাস্তা চলে গেছে। সেখান থেকে শিঙ্গার প্রতিধ্বনি শোনা যেতে লাগল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

উনগুরুর বাড়িতে বিজলি নেই, হ্যাজাক জ্বলে। বারান্দার চারদিক শক্ত জালে মোড়া, সেইখানে গরমের সময়ে সবাই শোয়া—খাট্টাসে কামড়াবে কি হুণ্ডারে টেনে নিয়ে যাবে, তার জো নেই। তাছাড়া জাল না থাকলে হ্যাজাক জ্বালবামাত্র কোথা থেকে ডানাওয়ালা ছোট-বড় লক্ষ লক্ষ পোকা উড়ে এসে ঝাঁক বেঁধে থাকত।

সন্ধ্যেটা দেখলাম অদ্ভুত। যেই না সূর্য ডোবা অমনি সব নিঃঝুম। টিলার নিচে কাজের লোকদের থাকবার ঘর থেকে বাসনপত্রের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, মিটমিট করে আলো জ্বলছিল। তার বাইরে বনটা

অন্ধকারে মোড়া। বারান্দায় হ্যাজাক জ্বলছিল, পোকারা এসে ঠুক ঠাক্ করে জালের গায়ে আছড়ে পড়ছিল। প্যালার মুরগি রাঁধার গন্ধ চারদিকে ভুর ভুর করছিল। প্যাস্টো কুকুরটার নাক ডাকছিল। আমরা উনগুরুর দুপাশে দুজন মোড়ায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ছোটমামা কিছু দূরে ঈজি চেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। অন্ধকারের দিকে তাকালে ওঁর নিশ্বাসের কষ্ট হয়। ছোটবেলায় একবার ওঁর নাকের মধ্যে একটা গিরগিটির বাচ্চা ঢুকতে চেষ্টা করেছিল কি না!

গুরুদেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, কিঁ চাস্ তোরা বল্ দিকি নি? যদি দুটো করে টাকা দিই'—আমরা বললাম, 'বাঘা আর বাউলের বিষয়'—উনগুরু সোজা হয়ে উঠে বসে নিজের বুকে কিল মেরে বললেন, 'এই যে দেখছিস্ ছেচল্লিশ ইঞ্চি ছাতি, বাঘার কাছে এ ও কিছু নয়!' গুপি বলল, 'আর বাউলের?' উনগুরু হা-হা করে হেসে উঠলেন। 'পাঁচ ফুট উঁচু, রোগা-পটকা, হাতে মাদুলীর গোছা, গাঁদালের ঝোল ছাড়া অন্য কিছু হজম করতে পারত না। অথচ ওর-ই ভয়ে বাঘা ঠকঠক করে কাঁপত! সুন্দর বনের বিজন বাউলে। তার ভয়ে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। অথচ একটা মশা মারতেও তার গুণীনের বারণ ছিল! সে-ও মরে গেল! আশ্চর্য!'

রান্নাঘর থেকে ঠিক এই সময় প্যালা বেরিয়ে কিছু বোধহয় জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। সে-ও সড়াৎ করে গল্প শোনার লোভে পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। একটু ভাবনা যে হল না, তাও নয়, কি জানি শেষটা মুরগি ফুরগি যদি পুড়ে—যাক্ গে! সেই অন্ধকারের মধ্যেও কালো চশমার ভিতর দিয়ে উনগুরু আমাদের মুখগুলো একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'উঃফ্! সে এক সময় গেছিল। একদিকে বাঘা আর এক দিকে বাউলে। কিন্তু বাউলের সঙ্গে বাঘার কোনো ঝগড়া ছিল না। সুন্দরবনে যারা একসঙ্গে খেটে খায় তাদের মধ্যে কখনো অ-বনিবনা হয় না।

'আমার হল অদ্ভুত এক অবস্থা। নদীর পুলিশে চাকরি;

বাঘাকে ধরার হুকুম। এতটুকু খবর আমাদের আস্তানায় পৌঁছলেই ছোঁক ছোঁক করে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু বাঘার পাত্তা পায় না কেউ! অথচ ঐ সুন্দরবনেই তার খোদ্ আস্তানা। তার দলের লোকরা নাকি বাঘ সেজে, গায়ে-মুখে বাঘের এসেন্স মেখে, নির্ভয়ে বাঘদের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। বাঘরাও তাদের আলাদা করে চিনতে পারত না। কম চেষ্টা করি নি আমরা। অথচ এত তথ্য জেনেও কেউ বাঘাকে ধরতে পারে নি। চারদিকে সব গাঁকে গাঁ ঠাণ্ডা করে রেখেছিল। যারা তাকে হপ্তায় হপ্তায় মাথা পিছু এক টাকা করে দিত, তাদের সে কিছু বলত না। না দিলে লুটপাট করে সব কেড়ে নিত, ঘর জ্বালিয়ে দিত, পাকা ধান কেটে নিয়ে যেত। সে সময়ে ঐসব পথে নৌকো করে যেতে হলে সঙ্গে বন্দুকধারী পাহারা নিতে হত। অথচ কেউ তাকে একবার চোখেও দেখে নি যে অতর্কিতে ধরে ফেলবে। অনেকে বলত সে নাকি ভালোমানুষ সেজে গাঁয়েই বাস করত।'

গুপি বলল, 'আপনিও ধরতে পারলেন না!' ছোটমামা বলে, 'আপনিও বাঘ-গোরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াতেন। আপনার দোর্দণ্ড প্রতাপের কাছে কেউ নাকি দাঁড়াতে পারত না।'

উনগুরু কাষ্ঠ হাসলেন। 'একবার আমার নির্দেশে আমাদের দল বন্দুক নিয়ে বিজন-বাউলের বারণ না মেনে গাছের উপর লুকিয়ে ছিল। গাছতলায় বাঘের থাবার দাগ দেখে বোঝা গেছিল ঐ নির্জন জায়গাটাই ওদের আড্ডা। গভীর রাতে কম করে পঁচিশটা বাঘ সেখানে এসে জুটল। কেউ শুল, কেউ বসল। আমাদের লোকেরা এরি জন্য অপেক্ষা করছিল। যেই না ইসারা করা, অমনি সবাই ঝুপঝাপ করে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দুমদাম, ফটাফট বন্দুকের শব্দ! আর যায় কোথা! বুক-কাঁপা হালুম হুলুম, হম্‌ম্‌ম্‌ হাম্‌ম্‌। শুধু বুক কেন, মাটিও কাঁপতে লাগল। কারণ ওগুলো সত্যি বাঘ ছিল। কিন্তু এমনি চমকে গেছিল যে বড় একটা কিছু করে উঠতে পারে নি, বরং কে কোন দিকে পালাবে তাই ঠিক

করতে পারছিল না।' আমি বললাম, 'চোখটা বুঝি তখনি বাঘে খুবলে নিয়েছিল?'

গুরুদেব হাসলেন, 'আরে ছ্যা, ছ্যা, বাঘের অত কাছে যাব, আমি তেমন মক্কেলই নই। চমকে গাছ থেকে পড়লাম একটা কাঁটা ঝোপের ওপর। তাইতেই চোখটা গেল! হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম, বাঘাকে চিনত শুধু এক বিজন বাউলে।'

'তাকে জিজ্ঞাসা করা হল না কেন?'

'হল না মানে? কিন্তু বাউলেরা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। ওদিকে আমার সঙ্গে তার বেজায় দহরম মহরম ছিল। তার ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম কি না।'

'কি রকম? কি রকম?'

'মানে মাছচুরির মামলায় পড়েছিল। আমার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কেউ খুঁজে পায় নি। খাসা রাঁধত ব্যাটা।'

হাঁ করে সব চেয়ে রইলাম আমরা, ছোটমামা সুদ্ধ উঠে বসে পড়লেন। উনগুরু বললেন,—

'আশ্চর্য সব ক্ষমতা ছিল বিজন বাউলের, বাঘ বশ করত। শুধু বাঘার বাঘ নয়, সত্যি বাঘরাও তার কথায় উঠত বসত। আর বাঘার দলের গুরু, পরামর্শদাতা, কোবরেজ, একাধারে ওই ছিল সব কিছু। তাদের সে কখনো ধরিয়ে দিতে পারে? তবে ছেলেকে বাঁচাবার জন্য কৃতজ্ঞ কম ছিল না। দুটো মাদুলী দিয়েছিল আমাকে। একটা বাঘতাড়া কবচ। যার হাতে বাঁধা থাকবে, বাঘে তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। অন্যটা বাঘডাকা কবচ। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ভেতরে ছোট এক দলা জড়িবুটি। বাইরে থেকে কিছু বুঝবার জো নেই, কিন্তু ঐ কবচ হাতে বাঁধা থাকলে, তার গন্ধে বনের বাঘ পোষা কুকুরের মতো পায়ে পায়ে হেঁটে চলে আসে।' ছোটমামা ব্যস্ত হয়ে বললে 'কোথায় থাকে সেটা? এখানেও বাঘ ফাগ এসে জুটবে না তো?'

উনগুরু হাসলেন। 'না হে, তুমি নিশ্চিন্তে আমাকে দিনের পর

দিন খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে পারবে। বাঘতাড়াটা হাতে বাঁধা থাকে, অন্যটাকে রাখি আমার নস্যির কৌটোতে। তাতে নাকি ওর গুণ ঝরতে পারে না। তবে কিছু দিন থেকে রাতে কেমন ছায়া ছায়া দেখি বাড়ির চারিদিকে। নস্যিতে নিশ্চয় ভেজাল দিয়েছে। ওরে প্যালা, টর্চটা আন্ দেখি।'

টর্চের আলোতে দুটো মাদুলীই দেখালেন গুরুদেব। হাতে বাঁধা-টাকে খুলে দেখালেন।

ছোটামমা ক্যাকাসে মুখে বললেন, 'এভাবে এগুলো ফেলে রাখা ঠিক নয়।' গুরুদেব বললেন, 'যতক্ষণ না হাতে বাঁধা হচ্ছে, ততক্ষণ বিশেষ কিছু হয় না।—আরে আরে!' কি করে যেন টর্চটা প্যালার হাত থেকে পড়ে গেল, গুরুদেব উঠলেন চমকে; হাতের মাদুলীটা গেল পড়ে। খোজ, খোঁজ। প্যালাই সেটা আবার উদ্ধার করে আবার ওঁর হাতে বেধে দিলে, অন্যটাকে কৌটো সুদ্ধ তাকে তুলে রাখল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাতের অমন ভালো খাওয়াটা তেমন্ জমল না। আমাদের মাথায় গল্পটাই ঘুরছিল। গুপি জানতে চাইল, 'তা হলে শেষ পর্যন্ত বাঘা ধরাই পড়ল না?' 'কে ধরবে ওকে? ধরলেও তো বাঘা বলে চিনতে পারবে না।' প্যালা মাংস পরি বেশন করছিল। সে হঠাৎ বলল, 'কেন চিনবে না? তার নাইয়ের দু'পাশে দুটো বাঘের মুখ উল্কি করা ছিল। ভগ্নীপোতের কাছে ছোটবেলায় শুনেছিলাম।' গুরুদেব বললেন, 'প্যালা, তুই থাম। তোদের গাঁয়ের লোকেরা যত রাজ্যের বাজে কথা বলে। নইলে সে ধরা পড়ল না কেন? আমিও পেনসন নিলাম আর বাঘার উপদ্রবও বন্ধ হল। যেন সে তারই জন্য অপেক্ষা করেছিল। বছর খানেক খোঁজাখুঁজির পর বাঘার ফাইল বন্ধ হল। সবাই বলল ব্যাটা নিশ্চয় মরে গেছে। আচ্ছা, একটা বুনো বুনো গন্ধ পাচ্ছ না তোমরা?'

তাই শুনে যে যার খাওয়া চুকিয়ে উঠে পড়ে ঘরে দোর দিল। সারাদিন যা ধকল গিয়েছিল। শোয়া আর ঘুম। কিন্তু ঘুম আর

হল না। শেষ রাতে সে কি চ্যাঁচামেচি! ছোটমামা উঠে দেখেন বারান্দার দোর হাট করে খোলা। প্যালা নিরুদ্দেশ!

সবাই বললাম, 'মাইনে কেটে দিন ব্যাটাকে তাড়িয়ে।'
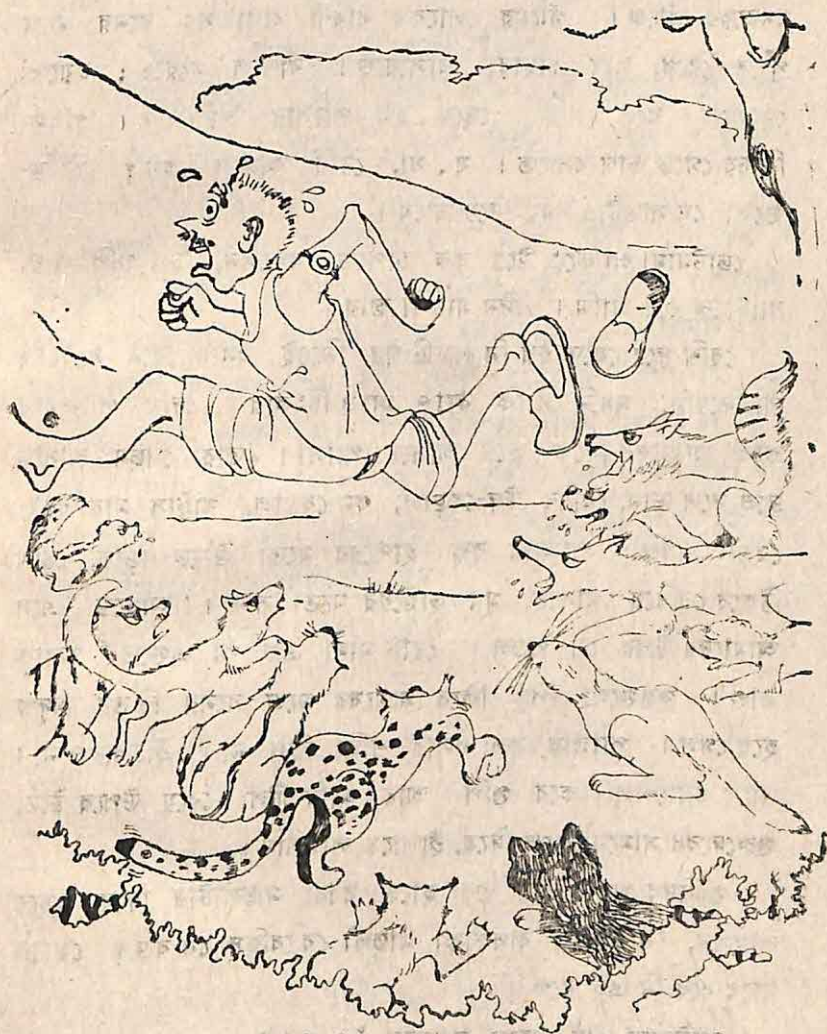
উনগুরু ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, 'ওরে, ওযে বড় ভালো রাঁধে, ওকে হাতছাড়া করলে চলবে না। এই যে, ধর আমার মাদুলীটা। চলে যা সুন্দরবনে, ওকে ফিরিয়ে আন্। কোনো বাঘ তোদের কাছে

আসবে না। আমার নিজের পরখ করা।'

গুপি বলল, 'কিন্তু—কিন্তু—' গুরুদেব তেড়ে উঠলেন, 'কিন্তু আবার কিসের? দুপুরে কে রাঁধবে শুনি? ও গেছে বাঘার ধনরত্নের খোঁজে। গাঁয়ের লোকের ধারণা বাঘা সব বনের মধ্যে পুঁতে রেখে, বাঘ পাহারা বসিয়েছে। বাউলে মরেছে; হয়তো ছেলেকে বলে গেছে। ছেলে হল প্যালার ভগ্নীপোত। প্যালা নিশ্চয় গেছে ভাগ বসাতে। যা, যা, দেরি কচ্ছিস কেন? চিংড়ি-গুলো যে সাতটার সময় দিয়ে যাবে।'

ছোটমামা লাফিয়ে উঠে বুক চাপড়ে বললেন, 'চল গুপি পানু, ব্যাটাকে ধরে আনি। দিন মাদুলী স্যার।'

বেশি দূরে যেতে হয় নি। টিলার নিচেই বন। বনে সবেমাত্র পা দিয়েছি, অমনি সে কি ক্যাঁও ম্যাও চিৎকার! দেখি পড়ি-মরি করে আমাদের দিকে ছুটে আসছে প্যালা। তার পেছন আসছে দলে দলে ভাম, বেজি, উদ-বেড়াল, বন-বেড়াল, খাট্টাস মায় কাঠ-বেড়াল পর্যন্ত! প্যালার বুক হাপরের মতো উঠছে-পড়ছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। আছড়ে এসে আমাদের উপর সে পড়ল। ছোট মামা এক পা এগুতেই অবাক কাণ্ড। জন্তুগুলো পিছু ফিরে নিমেষের মধ্যে বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। প্যালার কথা বলার শক্তি ছিল না। হাঁটবারও না। তাকে চ্যাংদোলা করে গুপি আর আমি টিলা বেয়ে উপরে উঠে, গুরুদেবের সামনে ফেলে দিয়ে, হাঁপাতে লাগলাম।

গুরুদেব অবাক হয়ে ওর হাতে বাঁধা মাদুলীটার দিকে চেয়ে বললেন, 'ওকিরে। বাঘডাকা মাদুলী বেঁধেছিস্ যে বড়? তোকে বাঘে ধরে নি এই রক্ষে!'

ছোটমামা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'এ তল্লাটে বাঘ নেই বোধ হয়। তবে আরেকটু হলেই ভামে আর কাঠবেড়ালীতে ধরেছিল!' গুরুদেব বললেন 'ভেজাল নস্যির ফল বোধ হয়!' প্যালা হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, 'আমি ভেবেছি ঐটেই বুঝি রক্ষা-কবচ। কাল রাতে

যখন পড়ে গেছিল, দুটিকে বদলে রেখেছিলাম। কিন্তু কি করে কি হল বুঝতে পারছি না। চিংড়িমাছ দিয়ে গেছে?'

উনগুরু বললেন, 'এবার বুঝলাম রোজ কেন ছায়া ছায়া দেখি, বুনো গন্ধ পাই। আমিই সেদিন মাদুলী দুটো পালিস করে, ভুল মাদুলী হাতে বেঁধেছিলাম। চিংড়ি এসে গেছে।' এই বলে গুরুদেব খুকখুক করে হাসতে লাগলেন। কালো চশমাটা কি করে জানি খসে পড়ে গেল। দেখলাম দুটো চোখই ভালো।

ছোটমামা বললেন, 'স্যার অনুমতি করেন তো একবার সুন্দরবনে যাই। কপিলমুনির আশ্রমটা দেখে আসি। বাঘার ধনরত্নেরও খোঁজ করি।'

উনগুরু বললেন, 'ওখানে কিছু রাখে নি বাঘা। জমিজমাতে ইনভেস্ট করেছে।' এই বলে অন্যমনস্কভাবে পেট চুলকোতে লাগলেন। স্পষ্ট দেখলাম নাইয়ের দু পাশে বাঘের মুখ উল্কি করা। আমার চোখে চোখ পড়াতে গুরুদেব একটু মুচকি হেসে বললেন, 'দুটো ফ্রি স্কুল চালাই। নিজে পড়তে শিখি নি। খবরের কাগজ পড়াতে হয় একে-ওকে দিয়ে। তারা বিরক্ত হয়।' আমরা দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'না, না, কেউ বিরক্ত হয় না। মানে রাতে যদি গল্প বলা হয়। চিংড়ির কি মালাইকারি হবে?'

বললাম না, বেড়ে কেটেছে ছুটিটা।

গুলুপণ্ডিতের গুলগপ্পো

আমার পিসিমা ভীষণ ভাল হলেও বেজায় ভীতু। সব জিনিসে তাঁর ভয়। যেখানে যা আছে তাতে ভয় আছেই, আবার অনেক জিনিস নেই তাকেও ভয়। বড় দিনের ছুটিতে একবার গেছি তাঁর বাড়িতে। মফঃস্বল শহর। খাবার-দাবারের ভারি সুবিধা। হপ্তায়, হপ্তায় ধোপা আসে, কুড়ি টাকা মাইনেতে এক্সপার্ট চাকর পাওয়া যায়। বাড়ির সামনে এবং পিছনে নিজেদের বাগান, দুপাশে পাশের বাড়ি-গুলোর বাগান ; সামনে ডাক্তারের বাড়ি। মোড়ের মাথায় সিনেমা। খেলার মাঠে প্রতি বছর এই সময় গ্রেট সরোজিনী সার্কাসের তাঁবু পড়ে। তাছাড়া ওখানকার প্যাঁড়া আর ক্ষীরের পান্তুয়া বিখ্যাত। আর এন্তার মুর্গি পাওয়া যায়। এমন জায়গা ঝপ্ করে বড় একটা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার আগেই ট্রেন থেকে নেমেছি। শিরশির করে গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইছে। ঠক্ ঠক্ করে কোথায় একটা কাঠঠোক্রা গাছ ঠোক্রাচ্ছে। লোকের বাড়িতে উনুনের আঁচ পড়ছে। পিসিমার গেটের ওপরে থোকা থোকা ফুল ফুটছে। সেদিন রাত্রে যখন বড় খাটের পাশে আমার ছোট নেওয়ারের খাটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুলাম, তখন খালি মনে হচ্ছিল দশ দিনের বদলে যদি একশো দিন থাকতাম কি মজাটাই না হোত।

কিন্তু সেকালের কোন এক ঋষি যে কথা ভূর্জপাতার খাতায় খাগের কলমে লিখে গেছেন যে এ পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু হয় না, সেটা ঠিক। পরদিন ভোরে পিসিমার সঙ্গে নিচে নেমেছি। পিছনের বারান্দার জালের দরজার ছিটকিনি খুলে গয়লানীর কাছে আমার জন্যে বেশি করে দুধ নেওয়া হচ্ছে, এমন সময় গয়লানী বললে, 'তালার ব্যবস্থা করুন মা। জালের ফোকর দিয়ে হাত গলিয়ে এ দরজাটা খুলে

ফেলতে দুষ্ট লোকের কতটুকু সময় লাগবে!'

পিসিমা বললেন—'কি যে বলিস বাতাসি, শুনলেও হাত-পা কাঁপে।' বাতাসি বললে—'না, বারানগড়ের জেলখানা থেকে-গুন্নুপণ্ডিত পালিয়েছে কিনা তাই বলছিলাম।'

গুন্নুপণ্ডিতের নাম শুনেই পিসিমার বুক কেঁপে উঠলো তবু জোর করে হেসে বললেন—'হ্যাঁ, তুই ও যেমন, কি আর এমন সোনা দানা আছে আমার ঘরে যে জেলভাঙ্গা ডাকাত ধরা পড়বার ভয় ভুলে, আমার বারান্দার ছিটকিনি নামাবেই!'

দুধের ক্যানাস্তারা নামিয়ে সিঁড়ির উপর বসে পড়ল বাতাসি। আমার দিকে তাকিয়ে এতটা গলা নামিয়ে যাতে স্পষ্ট আমি শুনতে পাই, বললে—'আহা সোনাদানা নয়, ওনাদের দল আছে, তারা ছেলে-ধরা করে নিয়ে যায়। তারপর বেনামি চিঠি দেয় শুঁদরিবনের কালী-মন্দিরের পেছনে বটতলাতে হাজার টাকা পুঁতে এসো তবে ভাইপো ফিরিয়ে দেব। না দিলে—'এই বলে বাতাসি এমন ভাবে চুপ করল যে পিসিমার কেন, আমারি গা শিউরে উঠলো!

বারান্দার কোনায় কাঠের টেবিলে বড় স্টোভে পিসিমার বুড়ো চাকর হরিন্দম চায়ের জল ফুটোচ্ছিল, সে এবারে বেরিয়ে এসে বললে—'আর ভয় দেখাবার জয়গা পাসনি বাতাসি, ও ছেলেকে কেউ নিয়ে গেলে ফেরৎ দেবার জন্য পয়সা চাইবে না বরং পয়সা দিয়ে ফেরৎ দেবে।'

বাবা বলেন, 'হরিন্দম বলে নাম হয়না অরিন্দম হবে।' মনে হতেই বললাম কথাটা। শুনে হরিন্দমের কি রাগ। বললে—'হ্যা, আমার বাবা নাম রাখল হরিন্দম আর ওনার বাবা তার চেয়ে বেশী জানেন! তাও যদি তাকে দাদামশায়ের কাছে কানমলা খেতে না দেখতাম।'

পিসিমা রেগে গেলেন—'ওসব কি শেখাচ্ছ বাপকে অশ্রদ্ধা করতে, হরিন্দম?'

হরিন্দম বললে—'হরি মানে ভগবান; তা ভগবানের নাম এনাদের সব আজকাল ভাল লাগবে কেন? অরিন্দম আবার একটা নাম হল?'

বাতাসি হেসে দুধের ক্যানেস্তারা নিয়ে উঠে পড়ল। যাবার আগে বলল—'দুধ নেবার সময় দারোগাবাবুর মা বললেন, 'গুনুপণ্ডিত এদিককার ছেলে নয়। কড়িগাছায় ওদের সাত পুরুষের বাস। সেখানেই পুলিস আগে যাবে গো মা, কাজেই সেদিকে না গিয়ে আগে এদিকেই তার আসা! পরে গোলমাল চুকে গেলে পর এই তিন কোশ পথ পেরিয়ে গুটি গুটি হয়তো মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে। এ আমার দারোগাবাবুর মা-র মুখ থেকে শোনা মা, তাই বলে গেলাম।'

বাতাসি গেলে পর রুটি টোস্ট, ডিমভাজা, চিনি দিয়ে কালকের দুধের সর, এই সব আমাকে দিতে দিতে হরিন্দম আমাকে বললে—'বাতাসির যেমন কথা! তালা-চাবিতে গুনুপণ্ডিতের কি করবে! মস্ত বড় পণ্ডিত সে, নানা রকম মন্ত্র জানে, কি একটু পড়ে দেবে, তালা আপনা থেকে খুলে যাবে।'

পিসিমা চটে গিয়ে বললেন—'পণ্ডিত না আরও কিছু, ঠ্যাঙ্গাড়ে গুণ্ডা বল।'

ঠিক এই সময় পিসেমশাইও নেমে এসে চায়ের টেবিলে বসে বললেন—'কে ঠ্যাঙ্গাড়ে গুণ্ডা?'

পিসিমা তাঁকে খাবার দিতে দিতে বললেন—'গুনু পণ্ডিত নাকি কয়েদ ভেঙ্গে ফেরারী হয়েছে! বাতাসি বলছিল এমুখো হবার সম্ভাবনা, দারোগার মা নাকি বলেছে।'

ডিম খেলে পিসেমশাইর হেঁচকি ওঠে, তাই সকালে পাঁউরুটি সাদা মাখন দিয়ে জেলি দিয়ে খান। তাতে এই বড় একটা কামড় দিয়ে বললেন—'একেবারে বাঘা ডাকাত ঐ গুনুপণ্ডিত, বুঝলি গুপি। প্রাণে এতটুকু ভয়ডর নেই, যা করবে ঠিক করেছে তা করবেই, মেরে ধরে ঠেঙ্গিয়ে, বোকা বানিয়ে যেমন করে হোক। ভাবতে পারিস সরকারী গুদোম থেকে পাঁচ হাজার মন ধান একসারি গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে কেটে পড়ল। বলল নাকি দিল্লী থেকে হুকুম হয়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে বিলি হবে। সাতদিন বাদে খোঁজ হলো। তাও ধরা পড়ত না, শুধু চৌকিদারটাকে দেরি করে তালা খোলার জন্যে টেনে এক চড়

কষিয়েছিল, সেই রেগে মেগে ধরিয়ে দিলে। একটা মুখোস পর্যন্ত পরে আসেনি এমনি সাহস।'

পিসিমা চায়ের পেয়ালাই ছোট একটা চুমুক দিয়ে বললেন—'বাঃ তুমি দেখছি গুন্নু পণ্ডিতের ভারি ভক্ত হয়ে উঠেছ! তার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।'

সামনের বাড়ি থেকে ডাক্তারবাবুর ভাই শৈলবাবু মাঝে মাঝে গল্প করতে আসেন। তিনি নাকি ছোটবেলায় একবার খুব বাতে ভুগেছিলেন বলে কাজ কর্ম সে রকম করতে পারেন না, পিসিমা বলেন। শৈলবাবু বললেন—'সাংঘাতিক লোকটা, একটা কিছু করার ঠিক করলে কেউ ঠেকাতে পারে না। সে নাকি অনেক রকম ভেল্কি জানে। কার যেন বন্ধ সিন্দুক থেকে হীরের আংটি বের করে নিয়েছিল সিন্দুক না খুলেই। খুব সাবধানে থাকবেন, বৌদি।'

মাছ বিক্রি করতে ঘনশ্যাম এল। সেও বললে—'বাবা! সাবধানের মার নেই, ছেলে পুলে নিয়ে রয়েছেন মা!' পিসিমা বিরক্ত হয়ে বললেন—'পুলিস দারোগা ডিটেকটিভ সবাই লেগেছে, আজ সন্ধ্যের আগেই তাকে ধরে ফেলবে দেখিস্। কি মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিস্ বল দিকিনি?

ঘনশ্যাম বললে—'ধরা কি অতই সহজ মা? থানে থানে নাকি তার আস্তানা আছে। এক এক জায়গায় এক এক নাম, এক এক চেহারা। তুড়ি মারতেই ভোল বদলে ফেলে, এই একরকম দেখছেন, এই দেখবেন অন্যরূপ! লোকে বলে এমনিতে হয় না, তুক করে।'

বেলা যতই বাড়তে থাকে সবার মুখে ঐ এক কথায় ফেরে—'গুন্নু-পণ্ডিত জেল ভেঙ্গেছে। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে সেই চৌকিদারের ধড় আর মাথা এক জায়গায় থাকতে দেবে না। মজা হয়েছে যে চৌকিদারটাও চাকরি ছেড়ে কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে কেউ জানে না। সবাই বলছে তাকে খুঁজে বের না করে নাকি গুন্নুপণ্ডিত ছাড়বে না। এদিকেই নাকি সব জায়গায় আঁতিপাঁতি করে খুঁজবে। তাছাড়া সরেজমিনে বামাল সমেত ধরা পড়েছিল, গুন্নুপণ্ডিতের আপাততঃ কিছু

রোজগারপাতির দরকার প:ড়:হ। কাজেই সবাই সবাইকে সাবধান করে দিতে লাগল।

মাঝখান থেকে আমার ছুটিটাই না মাটি হয়। পিসিমা ঘনশ্যামকে সঙ্গে করে একটু পরেই দারোগা-গিন্নির কাছে খবর সংগ্রহ করতে গেলেন। ফিরলেন সেই বেলা এগারটার পর। তখন আর আমার মাছের চপের সময় রইল না, এমনি ঝোল খেতে হল। পিসিমা দুটো বড় বড় মাছ ভাজাও আমার পাতে দিয়ে বললেন—'একা একা মোটে বেরুবে না, কেমন বাবা? সাংঘাতিক দুর্ধর্ষ ডাকাত, দু-একটা ছোট ছেলেকে নিখোঁজ করে দেওয়া ওর কাছে কিছুই নয়।'

শুনে আমার হয়ে গেছে, কবে থেকে কত আশা করে আছি। বললাম—'তবে কি ঘোষদের পুরনো পুকুরে মাছ ধরতে যাব না?' পিসিমা ভয়ে চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'ও বাবা। ও কথা মুখে আনিস নে, তোকে ডুবিয়ে দিয়ে কাদার মধ্যে ছিপ পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ। কথা দে, পুকুরে যাবিনে। বিকেলে মাংসের সিঙ্গাড়া করব।'

'ছাপাখানার বটকেষ্টবাবু তাঁর এক গেরুয়া পরা গুরু ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এলেন দুপুরে খাওয়ার আগে। পিসেমশাইয়ের সঙ্গে তার বেজায় ভাব, তাঁদের দেখে পিসেমশাই লাফিয়ে উঠে বললেন—'বাঃ বটকেষ্ট করনবাবা তো আমারো গুরু, ইনি তাহলে আমারো গুরু ভাই।'

বটকেষ্টবাবু ভারি চিন্তিত মুখ করে বললেন—'সেইজন্যই তো বনমালী ভাইজীবনকে তোমার কাছে আনলাম ঘেঁটু, গুরুদেবের কাজ করে বেড়ায়, যেমন জোটে তাই খেয়ে শরীরের কি হাল হয়েছে দেখছ? তাই গুরুদেব চিঠি দিয়ে শরীর সারাবার জন্যে ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। পোড়াকপাইল্যা, ওদিকে আমার বাড়ি থেকে জানোই তো দশদিনের আগে তোমার বৌদির বোনেরা নড়বে না।'

আর বলতে হল না। আমার সামনেই গেরুয়া পরা ভদ্রলোকের এ বাড়িতে থাকার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। দোতলার ভাল ঘরটা তাঁর

জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। পিসিমা আর আমি নিচে নেমে এলাম। তবে একটা সুবিধাও হয়ে গেল, ভদ্রলোকের নাকি দুধ, ঘি, মুর্গি, ছানা, ডিম এই সব পথ্যি। তার মানেই পিসিমা আমাকে সমান ভাগ দেবেন।

বটকেষ্টবাবু উঠে পড়ে বললেন—'ইয়ে কি বলে, ঘেঁটু, বনমালী ভাইজীবন আবার একটু নার্ভাস প্রকৃতির, দরজাটরজাগুলো তোমাদের যেন বড় লটখটে মনে হয়, একটু ভেতর থেকে তালার বন্দোবস্ত করে দিলে ভালো হয়—'

আমি বললাম—'ঘনশ্যাম বলেছে তালার কম্ম নয়, সে তুক করে তালা খোলে।' শুনে বনমালী ভাইজীবন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন-'তুক-তাকে যোগ দেবার যে আমার গুরুদেবের বারণ আছে।'

বটকেষ্টবাবু হেসে উঠলেন—'আহা, তুমিও যেমন, ওসব মুখ্যুদের বাড়ান কথা। তুক না আরও কিছু, গুদমের তালা সে কি চৌকিদারকে দিয়ে খোলায় নি বলতে চাও? সাবধান থেকো সবাঃ; তবে হয়তো দেখবে কালকের মধ্যেই ধরা পড়ে গেছে। এখানে কোন ভয় নেই।'

বনমালী ভয়ে ভয়ে উঠে পড়ে বললেন—'মানে, ভয় পাই না ঠিক, তবে আমার ছোটবেলা থেকে বুক ধরফড়ের ব্যারাম আছে কিনা।' তাঁকে অনেক আশ্বাস দিয়ে বটকেষ্টবাবু গেলেন। ঠিক হয়ে গেল বনমালীবাবু আর সিঁড়িটিড়ি ভাঙ্গবেন না, খাবার-দাবার স্নানের জল সব দোতলায় পৌঁছে দেওয়া হবে। বাবা! তাঁর ভয় দেখে বাঁচি না, পিসিমাকেও হার মানিয়েছেন!

দুপুরের খাওয়াটা ঠিক সেরকম জমল না। পিসিমারা ওঁকে নিয়েই ব্যস্ত তা আমাকে দেখবেন কি! আর হরিন্দম বললে নাকি বেশি মাছের বড়া খেলে পেট কামড়ায়! এদিকে শীতের দুপুরে চারদিক অন্ধকার করে বেশ মেঘ জমেছে, কন্‌কনে হাওয়া বইছে। এমন দিনে কি ঘরে বসে থাকা যায় কখনো? ওদিকে পুরনো পুকুরে মাছ ধরতে পিসিমার বারণ। অবিশ্যি স্টেশনের পুকুরের কথা তো কিছু বলেন নি। দুপুরে সবাই ঘুমুলে যেন আরো অন্ধকার করে এল, সেই সময়ে মাছরা

সব ঘাঁই মারে। ছিপটা নিয়ে গুটি গুটি পিছনের বারান্দার তারের দরজা খুলে যেই না আতা বাগানে ঢুকেছি, দেখি আতা গাছের তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে।

কি আর বলব! আরেকটু হলেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম! চিনিয়ে দেবার দরকার নেই, দেখলেই চেনা যায়, ছ-ফুট লম্বা তাগড়া জোয়ান এতখানি বুকের ছাতি ইটের মত শক্ত, পায়ের গুলিতে হাতুড়ির বাড়ি মারলেও কিছু হবে না, লাল টকটক করছে দুচোখ আর একমুখ ঘন দাড়ি, পরণে ঘোর নীল সার্ট আর হাফ প্যান্ট। লুকিয়ে থাকবার পক্ষে এর থেকে ভাল সাজ আর কি হতে পারে?

আমাকে যে আঙ্গুল বেঁকিয়ে ডাকল। বলল—'খিদে পেয়েছে, খাবার আন্! বললাম—'হরিন্দম ডুলিতে তালা দিয়েছে।'

অমনি পকেট থেকে একগোছা চাবি ফেলে দিয়ে বললে—'এই নাকি?' দেখে আমার গায়ের রক্ত জল! ঢোক গিলে বললাম—'তবে কি অরিন্দম আর নেই?'

লোকটা তো অবাক! বলল—'কি জ্বালা, বলছি তার পেটে ব্যথা হয়ে শুয়ে রয়েছে, আমি তার জ্ঞাতি ভাই, খুব ভাল রাঁধি। এখন যাও দিকিনি, ডুলিতে কি আছে আমার জন্যে বের করে আনো।'

অগত্যা তাই দিলাম, আট-দশটা মাছের বড়া পাঁউরুটি দিয়ে সে দিব্যি খেয়ে ফেলল; হয়তো সেগুলো আমারি জল খাবারের জন্য তোলা ছিল। খেয়েদেয়ে মুখ চাটতে চাটতে বলল—'কি অমন করে তাকাচ্ছ কেন? খিদে পেয়েছিল খেয়েছি তো হয়েছে কি? যাচ্ছেতাই রান্না হয়েছে বাপু। রাতে এর তিনগুণ ভাল করে রেঁধে দেবো। হরিন্দমের পেট ব্যথা, সেতো আর পারবে না। তোমার মা-বাবাকে বলে রেখো, হরিন্দমের জ্যাঠতুতো ভাই বাঁধবে!'

বললাম—'মোটেই আমার মা-বাবা নয়, পিসিমা—পিসেমশায়। তাছাড়া এই যে বললে জ্ঞাতি ভাই?' লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল—'ঐ একই হল, জ্যাঠতুতো ভাই বুঝি জ্ঞাতি ভাই নয়?'

তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে একবার আমাকে হরিন্দমের ঘর

থেকে ঘুরিয়ে আনল। নাক অবধি কম্বল চাপা হরিন্দম গোঁ-গোঁ করছে। দেখেই আমার হাত-পা পেটে সেঁধিয়েছে! সে হরিন্দমকে বললে—'বল, মাথা নেড়ে বল, আমি তোমার জ্ঞাতি ভাই, তোমার পেট ব্যথা হয়েছে তাই আমি রাঁধব।'

হরিন্দমও তার কথা মত মাথা নাড়ল।

পিসিমাকে হরিন্দমের অসুখের কথা বলে সেই ব্যবস্থাই করা গেল। সত্যি খাসা রাঁধে লোকটা, সবাই খেয়ে মহাখুশি। বনমালী-বাবুর চেহারা বদলে গেল, দেখতে দেখতে ছাই রঙের মুখটাতে একটু রং ধরল! আহা, তাই যেন হয়, হরিন্দমের পেট ব্যথা এ দশদিনে যেন না সারে। আমরা খেয়ে বাঁচি।

লোকটা এখন নাম নিয়েছে সখারাম। দিব্যি লেগে গেল হরিন্দমের বদলে রান্নার কাজে। সেই দশদিন পিসিমার বাড়িতে যে কত রকম পরটা কাবাব কালিয়া ঝালফিরোজি, ইত্যাদি চলল আর সে ক্ষীর চমচম, ঘরে তৈরী মালাই যে না খেয়েছে তাকে বলাই বৃথা।

অবিশ্যি আমি ভাল করে কিছু খেতে পারিনি, কারণ আমি জানি সখারাম হল গুন্নুপণ্ডিত। ভেল্কি দিয়ে রান্না করে। হরিন্দমের মোটেই দশদিন ধরে পেট ব্যথা হয়নি, গুন্নু তার মুখে গ্যাগ পরিয়ে, হাত-পা বেঁধে কম্বল চাপিয়ে দিয়ে রেখেছে। সব জানি, কিন্তু বলি কোন সাহসে? এক নিমেষে সবাইকে কচুকাটা করে ফেলবে না? ব্যাটার এমনি সাহস যে শেষ দিনে রেঁধে বেড়ে পিসেমশায়ের বন্ধুবান্ধবদের পরিবেশন করে খাওয়ালে। কেউ কিছু সন্দেহ করল না, খালি বনমালী-বাবু যোগীপুরুষ, হয়তো বা মন্ত্রবলে কিছু বুঝে থাকবেন। বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছে দেখলাম। কিন্তু রান্নার সব চেয়ে বেশি প্রশংসা করলেন উনিই আর রোগা পটকা হলে কি হবে, খেলেনও সবচেয়ে বেশি।

খাওয়ার শেষে সবাইকে জাফরান দেওয়া ক্ষীরের সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, চার-পাঁচজন পুলিস অফিসার, কনস্টেবল, ইত্যাদি এসে হাজির। তাদের পিছনে হরিন্দমের মুখটা

দেখেই আর আমাকে বলে দিতে হল না যে সখারাম রান্নাবান্না নিয়ে আজ মসগুল, এই ফাঁকে কেমন করে দড়া-দড়ি খুলে পালিয়ে গিয়ে হরিন্দম পুলিস ডেকে এনেছে! কি ফ্যাকাশে রোগা হয়ে গেছে হরিন্দম। এবার আমাদের পোলাও কালিয়া খাওয়াও তা হলে ঘুচল।

পুলিসেরা ঘরে ঢুকতেই অবাক কাণ্ড! বনমালীবাবু একটা অস্ফুট চিৎকার করে পিছনের দরজা দিয়ে দৌড় মারলেন। কিন্তু সেখানেও লোক ছিল, দেখতে দেখতে তারা তাঁর হাতে হাতকড়া পরাল। আর সখারাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষীর মাখা হাত দিয়েই মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

কারো মুখে প্রথম কথা সরে না। তারপর সম্বিৎ ফিরে এলেই পিসেমশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন—'ওকি হলো দারগাবাবু, বনমালীবাবু আমার গুরু ভাই, আপনি কাকে ধরতে কাকে ধরছেন।'

দারোগাবাবু বললেন—'ধরছি ঠিকই, এই রোগাপটকা লোকটিই সেই বিখ্যাত ডাকাত গুনুপণ্ডিত।'

আমি আঙ্গুল দিয়ে সখারামকে দেখিয়ে বললাম—'আর ও তবে কে? এতক্ষণ পর বনমালীবাবু অর্থাৎ গুনুপণ্ডিত কথা বললেন—'ও হলো চাল গুদোমের চৌকিদার। ওর বুড়ো আঙ্গুলের কালো আঁচিল দেখেই চিনেছিলাম, তবে এত ভাল রাধে বলে কিছু বলিনি। কিন্তু এখন তোকে বলছি শোন্।'

বলতে বলতে আমার চোখের সামনে গুনুপণ্ডিতের রোগাপটকা শরীরটা যেন দু-গুণ বড় হয়ে উঠল, গলার আওয়াজ থেকে বাজের শব্দ শোনা যেতে লাগল। সখারামের মুখ কাগজের মত সাদা, হাত-পা ঠক্ঠক্। গুনুপণ্ডিত বলতে লাগল 'শোন্, ভালো করে। তিন বছর বাদে আমি জেল থেকে বেরুব। বেরিয়েই যেন দেখি তুই আমার গুরুদেব করম বাবার আশ্রমে রাঁধছিস। এক্ষুনি চলে যাবি সেখানে। ঘেঁটুবাবু, দয়া করে ওর মাইনেটে চুকিয়ে দিন। তিন বছর বাদে ফিরে এসে আমি রিটায়ার করব, বাকী জীবনটা আশ্রমেই কাটাব। তুই যেন হাজির থাকিস, ভাল চাস তো!'

পুলিস অফিসারদের একজন একটু কেশে বললেন—'তিন বছর নয় স্যার, সম্ভবতঃ চার, জেল ভাঙ্গার ফল আছে তো।'

গুনুপণ্ডিত চোখ পাকিয়ে বলল—'ঐ একই, তিনেতে চারেতে তকাৎটা কি হল শুনি? মনে থাকে যেন সখারাম!'

সখারাম একগাল হেসে হাতজোড় করে বললে—'আজ্ঞে আমি এখন থেকেই তেনার শিষ্য বনে গেছি। তবে মাইনের কথাটা তেনাকে একটু বলে দেবেন।'

দ্বিতীয় টিকটিকির অন্তর্ধান

আমার নাম পানু। আমার চোদ্দ বছর বয়স। ক্লাস নাইনে উঠেছি। গুপি, আমার বন্ধু। আগে আমরা ভাবতাম আমরা চাঁদে গিয়ে ব্যবসা করব। এখন ঠিক করেছি টিকটিকি হব। টিকটিকি মানে যে ডিটেকটিভ, খচমচ করে ছাদে-হাঁটা চার-পেয়ে জন্তু নয়, আশা করি সে কথা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আমাদের, আদর্শ হলেন গুপির ছোটমামা। তিনি এখন বর্ধমানে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে দ্বিতীয় টিকটিকির কাজ করেন। অর্থাৎ গা-ঢাকা দিয়ে তদন্ত চালান। প্রথম টিকটিকি মাইনে বেশি পায় বটে কিন্তু তাকে বর্ধমানের সবাই চেনে। তাতে তার গোপনে কোনো কাজ করার অসুবিধা হয়। এমন কি বর্ধমানের ছেলেছোকরারা নাকি তাঁর নাম দিয়েছে ছুঁচো।

ছোটমামার কথা আলাদা। তাঁকে কেউ বড় একটা চেনে না। রোগা লিকৃলিকে খেমো চেহারা, পাঁচ দিনে একবার দাড়ি কামান, যাঁড় দেখলে তাঁর হাটু বেঁকে যায়, বেড়াল দেখলে তোতলামি এসে যায়, আরশুলা দেখলে ভির্মি খান! কে বলবে যে এর পিছনে একটা

দুঁদে অনুসন্ধানকারী আছে। তাঁর কাছেই আমাদের দুজনের টিকটিকি বিজ্ঞানে হাতে খড়ি।

সে যাই হোক, বড়দিনের বন্ধে একদিন সন্ধ্যেবেলায় মন খারাপ করে বসে আছি। আমার পেয়ারের হুলোবেড়াল নেপোকে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সময় গুপি আমাদের স্ট্র্যাণ্ড রোডের তিনতলার ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত। চেয়ে দেখি তার মুখটা পাঙশা-পানা, চুল উস্কো-খুস্কো, চোখের নীচে কালি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ছোটমামা ডিস্যাপিয়ার্ড!' নেপোর কথা ভুলে গেলাম। থেকে থেকে ও এমনিতেই পালায়। তারপর পাশের বাড়িতে শোনা যায়—কে মাছ খেল! কে ক্ষীর খেল! ছোটমামার উপর বেজায় চটে গেলাম। পরশু আমাদের নিয়ে ডানকুনিতে মাছ ধরতে যাবার কথা, যাদের পুকুর তারা খুব খাওয়ায়, এই কি ডিস্যাপিয়ার করবার সময়? বললামও তাই। ধপ্ করে আমার ঘরের বড় আরাম কেদারায় বসে পড়ে গুপি বলল,—'ঠিক তাই। স্বেচ্ছায় সে ডিস্যাপিয়ার করে নি, এটা ঠিক। কিন্তু কে শোনে!'

শুনে অবাক হলাম। 'তার মানেটা কি? বাড়ির লোকেরা কি তার খোঁজ করছে না?'

গুপি মাথা নাড়ল। 'খোঁজ তো করছেই না। বরং উল্টে যা-নয় তাই বলছে। কারণ তাদের ধারণা, পাছে বড়মাসির অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িটা দু-চারদিন আগলাতে হয়, সেইজন্য সে কেটে পড়েছে।'

তা পড়তেও পারে। বললাম সে কথা। উত্তেজনার চোটে গুপি আরাম কেদারার হাতল থেকে ঠ্যাং নামিয়ে নিল। বলল,—'তুই-ও যদি একথা বলিস্, তাহলে ছোটমামাকে বাঁচাবার কোনো উপায় দেখি না। আসলে দুষ্কৃতকারীরা তাকে গুম করেছে। কিন্তু কাকে বলি সে কথা।'

উঠে পড়লাম। রামকানাইদাকে বললাম—'কি কি ভালো খাবার আছে নিয়ে এসো।' রামকানাই মাছের চপ আর আলু-

মটরের ঘুগনি এনে দিল। গুপি যখন কোনো কথা না বলে মাত্র চারটে চপ আর দুই প্লেট ঘুগনি খেয়ে মুখ ধুয়ে ফেলল, বুঝলাম বেচারি সত্যি বড়ই চিন্তিত।

বললাম—'সব কথা খুলে বল। আমি আছি।' তার উত্তরে গুপি যা বলল, তা শুনে আমি থ। প্রথমে পকেট থেকে একটা কালো রঙের কিসের দলা বের করে বলল, 'এটা আমাদের একমাত্র ক্লু।'

'এটা আবার কি? আলকাতরার মতো গন্ধ।'

'আলকাতরা হলে ভাবনা ছিল না। সম্ভবত পিচ্-ব্লেণ্ড, এতে থোলো থোলো ইউরেনিয়ামের অক্সাইড থাকে। হয়তো এরই জন্য ছোটমামাকে অকালে হারালাম।' এই বলেই গুপি বার বার নাক টানতে লাগল। ইউরেনিয়াম শুনেই আমি জিনিসটাকে হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলাম। গুপি সেটা পকেটে পুরে বলল,—'প্রাণের ভয়টা খুব বেশি দেখছি।'

তারপর কাষ্ঠ হেসে বলল—'নাঃ, তোর সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই, তুই আমার একমাত্র সহায় এবং বন্ধু। আচ্ছা, ছোটমামার বন্ধু ডক্টর পাকড়াশীকে মনে আছে? সেই লোকটাই এই ব্যাপারের মূলে আছে বলে আমার সন্দেহ। অন্তত সে নিশ্চয়-ই কিছু জানে। তিনদিন ধরে দুজন মিলে দিনরাত গুজুর-গুজুর, ফুসুর-ফুসুর। তারপর দুদিন হয়ে গেল ছোটমামা নিখোঁজ। দিদিমা এমনি নিশ্চিন্ত যে দেখে এলাম ক্ষীরের ছাঁচ তুলে রাখছেন। ফুরিয়ে গেলে চাঁদু চটবে। চাঁদু বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ, তাঁর জন্যে ক্ষীরের ছাঁচ তুলে রাখার কথা ভেবে ছ্যাখ একবার!'

ছোটমামার ডাক নাম চাঁদু, আশা করি, সবাই সেটা বুঝে নিয়েছ। এই বলে গুপি আরো দু-তিনবার জোরে জোরে নাক টেনে বলল— 'ওগুলোকে সাবাড় করেছি। ছোটমামাকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে তো আর ভালো জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া যায় না! পানু, পিচ্-ব্লেণ্ডের কারবার বে-আইনী। ছোটমামা নিশ্চয়ই আসলে ছুটিতে নেই, গোপন

তদন্তে ব্যস্ত। ওদের হালচাল এতদিনে আমার অনেকটা জানা হয়ে গেছে। পাকড়াশী নতুন গাড়ি কিনেছে, তা জানিস? স্রেফ পিচ্-ব্লেণ্ডের টাকা ছাড়া আর কিছু দিয়ে নয়। বন্ধুদের কখনো বিশ্বাস করতে হয় না, এটা লিখে রাখ!'—আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম, 'তা না-ও হতে পারে। হয়তো পৈত্রিক পয়সাকড়ি আছে।'

গুপি বলল, 'কাঁচকলা আছে। নাকি গবেষণা করে! যারা গবেষণা করে, তাদের কখনো পয়সা থাকে? থাকলে তারা কখনো গবেষণা করত ভেবেছিস? তাছাড়া পাকড়াশীও নিখোঁজ। ওদের বাড়ি গিয়ে দেখে এসেছি। ওর দেরাজের মধ্যেই কাগজে মোড়া ঐ কালো জিনিস পেয়েছি। তাতেও আলকাতরার গন্ধ।'

এবার না উঠে পারলাম না। তাড়াতাড়ি করে যে-কটা চপ বাকি ছিল সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে, ঘুগনি পকেটে পুরে, পায়ে চটি গলিয়ে বললাম, 'আগে আরেকবার পাকড়াশীর বাড়ি চল। কাছেই তো, হেঁটেই যাওয়া যাক।'

গুপি বলল, 'ওর মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওর বিশ্বাস, ছোট-মামাই ওঁর ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। এক ফাঁকে দেরাজটা দেখে নিয়েছিলাম।'

আমরা কড়া নাড়তেই উপরের জানালা থেকে পাকড়াশীর জাঁদরেল মা উঁকি মেরে কড়া সুরে বললেন, 'বলে দে কচিপানা চর পাঠালে কিচ্ছু হবে না। বরং অবস্থা আরো মন্দ হয়ে উঠবে। আর দ্যাখ্, চতলার মাস্টার মশায়ের বাড়িতে একবার খবর দিয়ে আয়, প্যালা ফেরারি, এখন যে যা খুসি করতে পারে আমি বাধা দেব না।'

কোনো রকমে সেখান থেকে সরে পড়লাম। চেতলার মাস্টার মশায়কে কে না জানে। অমন অমায়িক মেধাবী বৈজ্ঞানিক ভূ-ভারতে জুটি নেই। খট্ করে রহস্যটা আমার মনের মধ্যে কিছুটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বললাম, 'গুপি, ভুল গাছের নিচে আমরা খেউ খেউ করছি! পিচ্-ব্লেণ্ডের ব্যবসা করা পাকড়াশীর কর্ম নয়। যারা ভালো মানুষ সেজে থাকে, সবার আগে তাদেরই

সন্দেহ করতে হয়। কাজেই মনে হচ্ছে, আসল বান্দা ঐ মাস্টার। জানিস তো ওঁর ছাত্ররা ওঁকে কেমন ঠাকুর পূজো করে। পাকড়াশী আর তোর ছোট মামাও তো ওঁর ছাত্র।

গুপি বলল, 'পাকড়াশীও কিছু কম যায় না। ওঁর সঙ্গে গবেষণাও করে। নিশ্চয় পিচ্-ব্লেণ্ডের কোনো গোপন কাগজপত্র নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। আগে হয়তো গাড়ি কিনবার পয়সা হাতিয়েছে। কে জানে মাস্টারকে হয়তো ব্ল্যাকমেল করে টাকাটা বাগিয়েছে। ছোটমামার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে ব্যাপারটা ফাঁস হতে কতক্ষণ? ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে নিশ্চয় কোথাও নিয়ে গিয়ে—' এই অবধি বলে গুপি এত ঘন ঘন নাক টানতে লাগল যে, আমার দস্তুরমতো ভয় হলো, নাকের ভিতর কিছুতে না জাম ধরে যায়। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তাহলে ছোটমামার চেয়ে পাকড়াশীর বুদ্ধি আরো তীক্ষ্ণ বলতে হবে।'

চেতলায় পৌঁছুতে রাত হলো। মাস্টারের বাড়ি নিঝুম। খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলাম। কোথাও টুঁ শব্দটি নেই, দরজা জানালা এঁটে বন্ধ, বুক ধুক-পুক। তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ গুপির ছোটমামা বলেন যে ভয়ে প্রাণ উড়ে না গেলে, কেউ সাহসী হতে পারে না। হাত-পা পেটে সেঁদুবে, তবু দুরু-দুরু বক্ষে কাজ করে যেতে হবে। নইলে যে ভয়ই পেল না, সে আবার সাহসী কিসের? তাহলে তো চেয়ার টেবিলও বেজায় সাহসী, ভূত দেখলেও ভয় পায় না।'

সে যাই হোক, দরজায় কত টকটক করা হল, তবু দরজা খোলে না, খালি মনে হতে লাগল বাড়ির ভেতর থেকে ঐ আস্তে আস্তে টকটকেও প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

হঠাৎ গুপি আমাকে খামচে ধরে বলল, 'ওরে প্রতিধ্বনি নয়, পানু, ঐ শোন, মর্স কোডে কে বা কারা যেন এস্-ও-এস্; এস্-ও-এস্ পাঠাচ্ছে। ও ছোটমামা গো! তাহলে তুমি আছ!' বলা বাহুল্য, ছোটমামাই আমাদের মর্স কোড শিখিয়েছিলেন। ঐ কথা বলেই গুপি

এমনি বিকট সুরে হাউমাউ করে উঠল যে, খট্ করে দোতলার একটি জানলা খুলে বাজখাই গলায় কে যেন বলে উঠল 'তাহলে এতক্ষণে সত্যিই এলি' রাস্কেলরা! শুনে আমরা থ। এ কি! এ যে রাস্তার বিজলি বাতিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মাস্টার মশাই, অথচ গলার আওয়াজ যে অন্যরকম শোনা যাচ্ছে। অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়লে এমনি করেই মানুষেরা বদলে যায়।

মাস্টার মশাই নিচে এসে দরজা খুলেই গুপিকে বললেন, 'মিউ-মিউ-ম্যাও!' সে কি! লোকটা গবেষণা করতে করতে ক্ষেপে গেল নাকি। মাস্টার মশাই আমার দিকে ফিরে বললেন, 'মিয়াও-মিয়াও-মিয়াও।' আমি হাঁ! গুপিকে বললেন, গর্-র্! গর্-র্! ফ্যাচ্' বলে খপ্ করে দুজনার ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

দেখি দুটো চেয়ারে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ছোটমামা আর পাকড়াশী বসে! ছোটমামার কোলে নেপো বসে বসে ওঁর উলের জামায় নখ ঘষে ঘষে তাতে শান দিচ্ছে। আমাকে দেখেই এক লাফে আমার ঘাড়ে বসে, গালে গাল ঘষে বলল, 'পিঁ-ই-উ।' তাই শুনে মাস্টারের চেহারা বদলে গেল। বললেন 'ভারি ইন্টারেস্টিং তো!' বলে আমার একটু কাছে আসতেই নেপো বলল, 'ফ্যাচ্!'

মাস্টার সরে গিয়ে বললেন, 'যেটুকু বেড়ালীর ভাষা শুনে শুনে শিখেছি তাতে মনে হচ্ছে ওর কাছ থেকে তফাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়!' তারপর মাস্টার মশাই হতাশভাবে বললেন, 'নাঃ কিছুই হল না। ওদের ছেড়ে দে।' বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তক্ষুণি যদি ওদের দড়ি খুলে দিই, ওরা পালিয়ে যাবে। মাঝখান থেকে আমাদের কিছুই শোনা হবে না, তাই গুপি আর আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। এদের দুজনারই গামছা দিয়ে মুখ বাঁধা। একটু হু-ম্-ম্-ম ছাড়া কোনো শব্দই বেরুল না। তবে মনে হল বেজায় রেগেছে।

মাস্টার মশাইকে বললাম' 'বলুন স্যার।' মাস্টার মশাই অন্যমনস্ক-ভাবে বলতে লাগলেন, 'জীব-জগতে যে বেড়ালের তুলনা হয় না,

এ-কথা প্রাচীন মিশরীয়রাও জানত! তাই—'গুপি বলল, 'স্যার সংক্ষেপে বলুন। এই বেড়ালটার খিদে পেয়েছে।' মাস্টার চমকে উঠে, তাড়াতাড়ি বলতে লাগলেন, 'মোটকথা বেড়ালদের নিজেদের ভাষা আছে, প্রাচীন জ্ঞানে ঠাসা! ঐ ভাষা না শিখতে পারলে কিছু জানা হবে না। বিশ্বাস করবে না হয়তো আমি কিন্তু পাঁচ-শো বেড়াল নিয়ে পরীক্ষা করেও কিছু জানতে পারিনি। ঐ পাকড়াশী বলল, যথেষ্ট ফী দিলে ওর বেড়াল-বিশারদ বন্ধু আছে, তাকে পাওয়া যাবে। একটা ট্রেণিং দেওয়া বেড়ালও পাওয়া যাবে। টাকা-ফাকা কোথায় পাব, লটারিতে জেতা আমার নতুন গাড়িটাই ওকে দিয়ে দিলাম। তা এখন বেড়াল-বিশারদকে ঝুটো মনে হচ্ছে, তাই দুটোকে বেঁধে রেখেছি। তখন আবার বলছে, আসল ভাষজ্ঞরা নাকি দুটি ছেলেমানুষ, যে-কোনো সময় তারা এসে পড়বে। বল শীগ্‌গির, তোমরাই কি তারা?'

বিপদে পড়লে যে উপস্থিত বুদ্ধি কাজ করে সে কথা ঠিক। তাই চট করে গুপি বলল, 'না, স্যার। তারা বিদেশে চলে গেছে।' আমি বললাম, 'মরেও গিয়ে থাকতে পারে।' মাস্টার ফিক করে হেসে বললেন, 'কে জানে হয়তো জন্মায়-নি। রোগাটার বাঁধন খুলে দে। আমার নখে ব্যথা। পাকড়াশী আগে গাড়ি ফিরিয়ে দিক। তবে ওকে ছাড়া হবে।'

ছোটমামার যেন বাঁধন খোলা হল, সটাং গিয়ে মাস্টার মশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরে বললেন—'কোনো মতেই কি গাড়িটা রাখতে পারবেন না, স্যার? আমার বড় সুবিধা হয়।'

'তা রাখতে পারব না কেন! আমার বদমেজাজী নিষ্কর্মা কালো মেয়েটাকে বিয়ে করলেই ওটা ওকে যৌতুক দেব।'

ছোটমামা একগাল হেসে বললেন, 'এই কথা স্যার? আমি বলি না জানি কি। তা, প্যালা নিশ্চয়ই খুসি হয়েই আপনার মেয়ে বিয়ে করবে। কি বলিস্, প্যালা?'

প্যালার হাত, পা, মুখ বাঁধা ছিল; কিন্তু কান খোলা ছিল।

একথা শোনবা মাত্র উৎসাহের সঙ্গে সে ঘাড় ছুলিয়ে সায় দিল!

প্যালার মা-ও খুব খুসি হলেন। আমরাও খুব ভোজ খেলাম। মাস্টার মশাই বেড়াল নিয়ে গবেষণা ছেড়ে দেবেন বলেছেন। বিয়ের পরদিন পকেট থেকে সেই অদ্ভুত কালো টুকরোটা বের করে গুপি মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার এটা কি পিচ্‌-ব্লেণ্ডের?' অমনি ছোটমামা ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বললেন, 'আরে, আরে ওটা যে আমার কাশির ওষুধ! কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। দে দে।' গুপি সেটাকে পকেটে পুরে বলল, 'তাহলে ওতে আলকাতরার গন্ধ কেন?'

প্যালার মা বললেন, 'ওমা, একটু আলকাতরা না দিলে কাশি সারবে কেন? ঐ খেয়েই প্যালা এত ভালো থাকে। ও যে আমার নিজের হাতের তৈরি। খেয়ে দেখবি নাকি একটু?'

———

চোদ্দ ডিঙা

গুপি-পানুও বেশির ভাগ ছেলের মতো ১৬ বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে গুপিদের পিতাঠাকুরদের আদি বাসস্থানে বেড়াতে গেল। কলকাতার জগন্নাথ ঘাট থেকে গঙ্গা-সাগর যাবার তিন ভাগ পথ পার হয়ে, তবে সেই জায়গা। জলপথে হয়তো মোটে ৬৫ মাইল দূরে, কিন্তু একেবারে অন্য দেশ, অন্য জগৎ। চারদিক রোমাঞ্চময়, অদ্ভুত; বাসিন্দাদের মেজাজ আলাদা; গাছপালার ঝোড়ো চেহারা; বাড়ির ছাদের গড়নে-ও একটু বৈশিষ্ট্য। নদীর ধারে উঁচু পাথুরে পাড়ি; সেখান থেকে অন্য রকম জল-জন্তুর চিহ্ন দেখা যায়; কখনো তিন-কোণা পাখনা; কখনো জলের ওপর রূপোলী টান, তার আগায় ছুটো ফুটো-ওয়ালা কালো হাঁড়ি। যারা চেনে, তারা বলে বদর বদর!

এখানে কোনো কালেও ব্রিটিশদের পুরোপুরি দখল ছিল না।

উপনিবেশকারী পর্তুগীজদের এরা নাকি বংশধর। তারা এসেছিল ব্রিটিশদের ঢের আগে। জলদস্যুর জাত। চাষ-বাস ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঘেন্নার চোখে দেখত। আজ পর্যন্ত তাদের বংশধররা চুরি চামারি লুট-তরাজকে পুরুষদের উপযুক্ত পেশা বলে মনে করে। তবে আজকাল সব সময় পেরে ওঠে না। বেজায় গরীব। নোনা মাটিতে ভালো ফসল হয় না ; কিন্তু এক জাতের সাদা মিষ্টি তরমুজ আর ত্রিবান্দ্রামের বেঁটে নারকোল লাগিয়ে একটু যত্ন করলেই, খুব ফলে। এই সব করে কোনো মতে ওদের সংসার চলে ! পর্তুগীজ হক, কি যাই হক, স্ত্রী-পুত্র, বিধবা পিসিমা ওদের ঘরেও ছিল।

গুপির ছোটমামা সে সময়ে শিমলায় নিরাপদে হোটেলের তদারকি করছিলেন ; তাই এদের দু-বাড়ির গুরুজনরা অনেকখানি নিশ্চিন্ত ছিলেন, ছেলে দুটো তাহলে নিরিবিলিতে পরীক্ষা দিয়ে পাস্ করবে। বুদ্ধি তো কম নয়, ঐ চাঁদু হতভাগাই—সে থাক না। গুপি-পানু নৌকোয় সারা পথ যাবে ; গুপির মেজদাদু নৌকো পাঠিয়েছেন। মাঝির চেহারা জলদস্যুর মতো ; এই বিরাট দশাসই শরীর ; পোড়া ঝামার মতো মুখের চামড়া ; রঙও প্রায় তাই। ডাক নাম পদো ভালো নাম নাকি পেদ্রো। তা হতেও পারে।

খুব ভোরে, তখনো আকাশে কয়েকটা তারা মিটমিট করছে, ভাঁটার সঙ্গে ওরা জগন্নাথ ঘাট থেকে ছেড়ে যাবে, এমন সময় বর্ধমানের সমাদ্দার ইন্‌ভেষ্টিগেশন্সের বুড়ো মিঃ সমাদ্দার ছুটতে ছুটতে এসে বয়েসের তুলনায় অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক লাফে নৌকোয় উঠলেন। সেদিকটা একটু কাৎ হল, কিন্তু জল উঠল না। এ মেজ-দাদুদের পৈত্রিক নৌকো।

বলা বাহুল্য সমাদ্দার ইন্‌ভেষ্টিগেশন্সেই তিন বছর চাকরি করে গোয়েন্দাগিরিতে গুপির ছোটমামা হাত পাকিয়েছিলেন আর এদেরো যে-টুকু অভিজ্ঞতা তার প্রায় সবটাই সেই সূত্রে পাওয়াতে সমাদ্দারকে ওরা একটু সুনজরে দেখত। হাঁসফাঁস করতে করতে খানিকটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে সমাদ্দার বললেন, "তোমরা একটু হাত না লাগালে

এবার আমার ২৫ বছরের পুরনো ব্যবসাটা উঠে যাবে।” কি ব্যাপার ? না, ব্যাপকভাবে সোনা পাচার হচ্ছে, কাউকে ধরা যাচ্ছে না।

পানু বলল, “তা আমরা কি করব স্যার ? পরীক্ষা দিতেই বুদ্ধি খতম। ছোটমামাকে লিখুন।” “সে উত্তর দেয় না। শেষের চিঠি ফেরত এসেছে। তার ওপর চাঁচুর নিজের হাতে লেখা নট্ নোন্। আর বুদ্ধির কথা কে বলেছে ? তার জন্যে আমি আছি। একটু চোখ-কান খোলা রাখবে, এই আর কি। এদিকে কোম্পানি লাটে ওঠার জোগাড়। অথচ এ কাজটা হাসিল করতে পারলেই সরকারি স্বীকৃতি, মোটা বার্ষিক অনুদান ইত্যাদি। চাঁচু বলছিল তোমরা থাকতে —” এই বলে সমাদ্দার চুপ। গুপি পানুর দিকে আড় চোখে চেয়ে বলল, “বেশ, তাই হবে। কিছু দেখলে জানতে পারবেন।’

তক্তাঘাটের পরেই সমাদ্দার নেমে গেলেন। নৌকো চড়লেই আর বিশেষ করে একসঙ্গে অনেকগুলো জাহাজ দেখলেই, তাঁর গা গুলোয়। মুখটা এরি মধ্যে বেশ সব্‌জেটে দেখাচ্ছিল। তখনো সবে ভোর। গুপি জলের দিকে চেয়ে বলল, “কি লোক দেখলে।” “কে ?” “মি সমাদ্দার।” “নাকি তোর ছোটমামা ?”

দুপুরে নৌকোর পাটাতনে ঝকঝকে বাসনে পদো ঝাল ঝাল চিংড়ির ঝোল আর মোটা লাল চালের ভাত রাঁধল। পানু, বৈঠা নিল। ওর মা আমের আচার আর কড়া পাকের সন্দেশ দিয়েছিলেন। খাওয়াটা মন্দ হয়নি। সন্ধ্যায় একটা গাঁয়ের ঘাটে নৌকো বেঁধে পদো বলল, “সব খাও তো ?” গুপি বলল, “সব, সব, এক ঝিঙে আর উচ্ছে বাদ।” পদো নাক সিঁটকে বলল, “ছো, ছো, ওগুলো আবার মানুষের খাদ্য নাকি !” নৌকোর ছাউনির মুখে বড় একটা লণ্ঠন ঝুলছিল। জলের ধারে চাটাই দিয়ে তৈরি একটা দোকান, তার ছাদ থেকেও একটা বড় লণ্ঠন ঝুলছিল। সেখান থেকে পদো তিনজনের মতো মোটা মোটা আটার রুটি আর কচ্ছপের কষা মাংস কিনে এনে, মাংসটা দু-ভাগ করল।

পানু বলল, “তুমি খাবে না ?”

পদো শিউরে উঠে বলল, "ও বাবা না! তাজা মাংস আমার সয় না, পেট-রোগা মানুষ। আমার জন্য শুকনো হাঙরের মাংসের ঝাল আম-তেল এনেছি। চাখবে নাকি?"

পানু ঢোক গিলে বলল, "বিট্‌কেল গন্ধ যে!" পদো চটে গেল, "তাই না আরো কিছু! খেতে জানলে তাজা জিনিস ছুঁতে না! আমরা পাখি মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখি। আপনা থেকে খসে পড়লে তবে রাঁধি। এটাই আমাদের ইউরোপী নিয়ম। আমরা মারিয়া মায়ের সন্তান!" এই বলে গলায় ঝোলানো একটা জঘন্য নোংরা খুদে থলি বের করে কপালে ঠেকাল।

গুপি-পানু অবাক। ইউরোপী নিয়ম? মারিয়া মায়ের সন্তান? এদিকে ওপর হাতে এক গোছা মাদুলী বাঁধা। আসবার ঠিক আগেও গুপির দাদুর কাছে কালিঘাটের শুকনো প্রসাদ চাইছিল। সে-কথা বলতেই পদো বিরক্ত হয়ে বলল, "বেশ বললে! মারিয়ামা-তে আর কালী-মা-তে তফাৎটা কি শুনি? দেখো গিয়ে আমাদের গাঁয়ের ফিরিঙ্গি কালীর মন্দিরে। যে-সে জিনিস নয় বাপু, সম্ভবতঃ রানী এ-ইজাভেলার টাকায় তৈরি। তখন তোমাদের পেয়ারের ইংরেজরা দেশে আসা দূরে থাকুক, নাও চড়তেই ঘাবড়াত। আমরা তাদের কোনো কালেও রাজা বলে জানিনি। আমরা হলাম গিয়ে খাঁটি পর্তুগীজ—একটু পান-সুপুরি পেলে হত!"

পানু বলল, "খাঁটি পর্তুগীজ তো এতো কালো কেন?" পদো দূরে নদীর বাঁকের আবছায়া অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদের কথা শুনে হাসি আসে। আমাদের তিনটে গাঁ-শুদ্ধু সবাই খাঁটি পর্তু-গীজ। নিজেদের মধ্যে ছাড়া আমরা ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিই না! আমরা সক্কলে কুচকুচে কালো। তাতে হয়েছেটা কি?"

এর কোনো উত্তর হয় না; তা-ছাড়া রাত-ও হয়েছিল। চারদিকে অন্য শব্দ নেই, শুধু নদীর একটানা ছলাৎ-ছলাৎ! ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। তারি মধ্যে গুপি একবার জিজ্ঞেস করল, "ও পদোদা, বাঘ-টাঘ সাঁতরে নৌকোয় উঠবে না তো?" পদোর কি হাসি। "কোথেকে আসবে

শুনি ? সবে তো বাঘের চাষ শুরু হল। নাও ঘুমোও। ভোরের আগেই পৌঁছব।"

ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, পুরনো ঘাটে নৌকো বাঁধা, জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে আর পাকা আমের মতো টকটকে রঙের একজন বুড়ো খুব হাঁকডাক করছেন। তিনিই গুপির মেজদাদু। ঘাটের কাছে বাড়ি, উঁচু পাড়ি বেয়ে যেতে হয়।

অদ্ভুত জায়গা। দিন-রাত হু-হু করে নোনা হাওয়া বয়। মেজ দাদু, বললেন, "হাওয়া খেয়ে গাছগুলোর আকার দেখেছিস ? আবার যদি হাওয়া পড়ল তো চারিদিক এমনি থম্-থম্ করবে যে মনে হবে যেন প্রলয় এল ! এখানকার ঝড় দেখবার জিনিস। সমুদ্রের জল উজান ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। নদী ফুলে ফেঁপে ঐ যে পাড়ির ওপর বড়-ঠানদিদির ঘর দেখছিস ? ওরি নিচে অবধি ওঠে। ওখানে পুরনো একটা নৌকো বাঁধার আংটা আছে পাথরের গায়ে গাঁথা ! বড়-ঠান-দিদির ঘরটাও পাথরের তৈরি। ছাদের কোণায় লণ্ঠন ঝোলাবার জায়গাও আছে। জেলেদের আর—আর জলদস্যুদের ঝড়ের আর নবাবের সেপাইদের বিষয়ে জানান দেবার জন্য। গোটা দুই পুরনো লণ্ঠন-ও আছে। ঠানদিদির পূর্ব-পুরুষরা বাতিদার ছিল। তারপর দিন কাল পাল্টে গেল। তারা খেতে পায় না। যে-যার কাজের খোঁজে চলে গেল। বছর দশেক হল, ওদের শেষ বংশধর ঐ থুথুরে বুড়ি এসে পূর্ব পুরুষদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ঐ এক রকম বলতে গেলে বড়-গাঙের মধ্যিখানে বুড়ি একলা থাকে। সেকালের হাড়, দাদু, তার তুলনা খুজে পাবে না।"

বাস্তবিকই তাই। বুড়ির হাতের কব্জি কি জোরালো, পায়ের আঙুলের গাঁট কি শক্ত ! পাথরের গায়ে এমনি এঁটে ধরে যে মনে হয় দেড়শো কিলোমিটারের ঝোড়ো হাওয়াতেও ওকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। চুলগুলো ছোট করে কাটা, মাথায় ঘোমটা, তার নিচে কুচকুচে কালো চোখ হাসির চোটে মিট মিট করছে, গায়ের রঙ নিরেট কালো। মেজদাদু ওদের নিয়ে গেছিলেন তৃতীয় দিনে, অন্য সব দ্রষ্টব্য জিনিস

দেখা হয়ে গেলে পর। হয় তো যাতে ওরা কিছুক্ষণের মতো অন্যত্র থাকে। আর উনি একটু শান্তিতে থাকতে পারেন। উনি গোয়েন্দা নবেল পড়তেন।

ফিরিঙ্গি-কালীর মূর্তিটা যে আদৌ কালীমায়ের নয়, তাতে গুপি-পানুর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। মনে হল আবলুশ কাঠের তৈরি সেকালের কোনো জাহাজের মুখে লাগানো মারিয়ামায়েরি মূর্তি হবে। বুড়ো পুরুতঠাকুর বললেন একবার নিদারুণ খরার সময় নদীর জল এমনি নোনা হয়ে গেছিল, শস্যও হল না; মানুষেরো প্রাণ যায়। ওরা তখন সবাই মিলে মা-কালীর মাটির মন্দিরে ধরণা দিল। সেই রাতে ভয়ঙ্কর ঘুর্ণি-ঝড় উঠে মা-কালীর মন্দিরটাকে ধুলিসাৎ করে, মাটির মূর্তি চ্যাপ্টা করে, তার জায়গায় সদ্য জল থেকে উঠে আসা এই ফিরিঙ্গি-কালীর মূর্তি ফেলে দিয়ে গেল। এর কাছে নাকি ভক্তিভরে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। মন্দিরের দরজার পাশে একটা পুরনো কাঠের ক্রুশ-ও ছিল। ঐ রকম কালো কাঠের তৈরি। ওদের মনে হল এ দুটোই সম্ভবতঃ কোনো ডুবে যাওয়া জলদস্যুদের জাহাজের মাথায় লাগানো ছিল। ঝড়ের দাপটে নদীর গর্ভ থেকে উঠে এসেছিল। সে যাই হক, এরা ভারি ভক্তি করে। এরা কেমন খৃশ্চান আর হিন্দু বিশ্বাস মিলিয়ে মিশিয়ে শান্তিতে বাস করছে। যে কারণেই হক, সবার ঘরে সাইকেল, হাতে হাত-ঘড়ি। পানু একবার গুপির দিকে চাইল। চাষবাস মাছ-ধরা থেকে আয়।

পদো নদীর মোহনার বড় গাঙ থেকে অদ্ভুত চেহারার মাছটাছ আনত। মাছ বললে ঠিক বলা হয় না। তবে জানোয়ার তাতে সন্দেহ নেই। মেজদাদুর বামুনঠাকুর সেগুলোকে যা রাঁধত, না খেলে বোঝানো যাবে না। সন্ধ্যেবেলায় নদীর ধারে বেড়িয়ে ফেরার পথে ওরা ঠানদিদির গল্প শুনত।

অদ্ভুত গল্প বলতেন। বাইরে বসলে বাতাসের তোড়ে কথা উড়িয়ে নিত, তাই বুড়ি ওদের ভেতরে বসাত। গোলমতো পাথরের ঘর, উঁচু ছাদ। সেই অবধি একটা সরু সিঁড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে গেছে।

দেয়ালে তাকের ওপর তাক। তাতে সারি সারি টিনের ট্রাঙ্ক, কাঠের প্যাঁটরা। "ও ঠানদিদি, এত জিনিস কার ?"
ফোক্‌লা দাঁতে হেসে বুড়ি বলল, "আমার রে দাদা। সব গুছিয়ে রেখেছি, কোন ফাঁকে আমায় নিতে নৌকা আসবে, তার আর তর সইবে না, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তে হবে।"

"কি রকম নৌকা, ঠানদিদি ?" ফিক্ করে হেসে ঠানদিদি বলল চোদ্দ-ডিঙা ছাড়া আবার কি ? জানিস্ আমার অতিবৃদ্ধ ঠাকুরদাদের দাপটে এ তল্লাটে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। ঐ আংটা দেখছিস্, ঐখানে তাদের চোদ্দ ডিঙা বাঁধা থাকত। নবদ্বীপ অবধি তাদের যাওয়া-আসা ছিল। বাড়ির বড় কর্তা একবার গেল তো আর ফিরল না। কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। সমুদ্রের বুকে এক সবুজ দ্বীপে সে রাজত্ব ফেঁদেছিল। আমি তার শেষ বংশধারিনী আমাকে সেখানে নে যেতে চোদ্দ-ডিঙাটি পেটিয়ে দেবে।"

"এত কি আছে বাক্সে ?"

"দেখবি ? আয় ছাখ ! আমার সারা জীবনের পুঁজি।" পুঁজি দেখে হাসি পেল। পুরনো জরি পাড়ের কাপড়, ফুঁটো কাঁসার থালা বাসন, লেস্-বোনা হাতপাখা, তক্‌লি, পুঁতির মালা, হলদে হয়ে যাওয়া কাগজ, এই সব। হাসিও পেল, দয়াও লাগল। আহা, বুড়ির এই পাগলের স্বপ্ন ছাড়া কিছু নেই। ঐসবের সঙ্গে ওর তোলা উনুন, হাঁড়িকুড়ি, থালা বাটি। বাইরে রাখলে নাকি খারাপ দেখায়। "আমাদের নেবে না, ঠানদিদি, চোদ্দ-ডিঙায় ? আমরা কখনো বিদেশে যাইনি।" বুড়ি হঠাৎ উঠে পড়ে একটা চারকোণা তেলের লণ্ঠন জ্বেলে তরতর করে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে, ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে লণ্ঠনটাকে পুরনো আংটায় ঝুলিয়ে দিল।

গুপি-পানুও উঠে পড়ল। রাতের খাবার সময় হয়ে এসেছিল। মেজদাদুর ছেলেদের বৌরা ভারি বদমেজাজী। গুপি হেসে বলল "ঐ ওদের পর্তুগিজ উত্তরাধিকার। আর তো কিছু পেল না, পানুকে একটু ভাবিত মনে হল, "আচ্ছা, বুড়ি ওখানে একদিন মরেও থাকলে

কেউ টের পাবে না।"

মেজদাছুর কাছে একদিন কজন লোক এল, নদী-পুলিশের লঞ্চে। ওঁর চেনা লোক। এসেই বলল, "মামাবাবু; আপনার লোকটিকে বলুন সেই গুগ্‌লির পোরে ভাজা করতে। মহা ফ্যাসাদে পড়েছি, মামা। কর্তারা বড় অবুঝ।" পোরে-ভাজার ফরমায়েস দিয়ে ফিরে এসে মেজ-দাছু বললেন, "হয়েছেটা কি?"

"কাগজ পড়েন না, মামা?" মেজদাছু শিউরে উঠে বললেন, "১৯০০ সালের পরে গল্পের বই ছাড়া ছাপা কিছু পড়ি না। কেন?"

"ইন্টার পলের খবর 'ফিলিস্' বলে বিদেশগামী বড় জাহাজ নাকি চোরাই সোনায় বোঝাই হয়ে কলকাতায় আসছিল। আচিপুরের কাছে এসে রাতের অন্ধকারে সে-জাহাজ ডুবন্ত বালির চরে আটকে গেল। পাইলটের কাজ পথ দেখিয়ে আনা, তার আদেশ নাকি ক্যাপ্টেন শুনলই না। অন্ততঃ পাইলট তাই বলছে। ওরা বলছে ডক্ খালি নেই শুনে ওরা ছুদিন ওখানে জিরুবে বলে নোঙর করতে গিয়ে, বালির চরায় আটকে গেছে।"

মেজদাছু বললেন, "ঐ যে গরম গরম পোরে ভাজা খাও?" ওরা খেতে খেতে বলাবলি করতে লাগল, "কি ভালো খেতে আর আমাদের বাড়ির লোকদের গুগ্‌লি শুনলেই গা গুলোয়।" মেজদাছু বললেন, "বুদ্ধি থাকলে তো খাবে! তবে এ গুলো ঠিক গুগ্‌লি নয়, কচি তরমুজের পোরে ভাজা। সেদিন ভুলে গুগ্‌লি বলেছিলাম। অনেকটা এক রকম দেখতে কি না। তা তোমাদের সমস্যাটা কি, তাতো বললে না।"

ওরা আমতা আমতা করে বলল, "জানি, আপনার বিশ্বাস আপনি নদী-পুলিসের চাকরি ছাড়ার পর থেকে আর কেউ'কোনো কাজ করে না, কিন্তু অতি গোপনে, অতি তৎপর ভাবে 'ফিলিস্' জাহাজ ঘেরাও করে আগাগোড়া চিরুণী-আঁচড়া করেও এক কণা সোনা পাইনি। ডুবুরি নামিয়ে জলের নিচেও নয়। জাহাজের তক্তা, লোহা, প্রায় সব খুলে ফেলেও নয়। লুকোবার জায়গা মেলা দেখা গেছে, কিন্তু সব ফাঁকা। কাপ্তেন নাকি ইন্টারপলে আমাদের নামে নালিশ করবে, নির্দোশ পার্টির

ওপর হাঙ্গামার জন্য। এক কোটি টাকা খেসারৎ চাইবে। চাকরি আর রইল না। চুপ করে আছেন কেন, কিছু বলুন।"

মেজদাদু বললেন, "হুঁম্। তাহলে ইন্টারপলের খবর বোধ হয় ভুল। আচ্ছা, খাওয়া হয়েছে, এবার এসো গে। দেখি কি করতে পারি।" দুপুরে খাবার সময় মেজদাদু গুপি-পানুকে বললেন, "দেখিস্ তো কিছু যদি চোখে পড়ে। তবে কিছু হলে তো বড় ঠানদিদি আগে দেখতে পেত। রাতে উঠে দুবার বাতিতে তেল ঢালে। আমরা সবাই চাঁদা করে তেলের খরচ দিই।" পরে বললেন, "ওর পূর্বপুরুষরাও কত সময়ে এখানে খেয়েছে, আশ্রয় নিয়েছে। তোদের মেজদিদিমা দু-বেলা ওর খাবার পাঠায় পদোর হাতে। ওকে রাঁধা বাড়ার বালাই করতে হয় না। ওর ধারনা ও বাতি না দিলে জাহাজ ডুবি হবে। আসলে ওখানে এঁটেল মাটি আছে, তাতে গাছ গজিয়ে এখন আর ঐ মিটমিটে তেলের আলো নদী থেকে চোখে পড়ে না। বিশেষতঃ যখন আগের বাঁকে জোরালো লাইট হাউস আছে। তা বুড়িকে কে বোঝায়। একটা লাল লণ্ঠনও আছে, নাকি বিপদের সংকেত। এদিকে রাঁধাবাড়া হাঁড়ি কড়াই উনুন ধরানোর জিনিসপত্রের ধারধারে না, বুড়ি সারাদিন আলোর ডোম সাফ করে, সলতে ছাঁটে। তাই নিয়েই সুখে আছে।"

মেজদাদুর বাড়ির পাথরের ভিৎ, পুরু ইটের দেয়াল। ছোট্ট ছোট্ট ইট, রোদে পুড়িয়ে তৈরি, হয়তো তিনশো বছর আগে। ছাদে একটি বড় ঘর, তার চারদিকে জানলা। সে জানলা দিয়ে হু-হু করে দিন রাত হাওয়া দেয়। সেই ঘরে গুপি-পানুর শোবার ব্যবস্থা। পুরনো একটা প্রকাণ্ড তক্তাপোষ, এই উঁচু; তার গায়ে কত গোপন খোপ, টানা দেরাজ। মস্ত একটা আলনা, তার নিচেটা বাক্সের মতো বড়, রোমাঞ্চকর ইংরিজি বইতে ঠাসা। বোধ হয় মেজদাদুর গোপন পুস্তকাগার! একটা লটঘটে টেবিল, তিনটে নড়বড়ে কাঠের টুল— এই হল আসবাব।

তাতে কিছু এসে যায় না। যতদূর চোখ যায়, সব দেখা যায়। নদীর ধারের পাথরের পাড়ি, পাড়ির ওপরে বড়-ঠানদিদির ঘরটি।

গুপিদের ঘরে আসার বাইরের একটা সিঁড়ি আছে। সেখান থেকে এক দৌড়ে তিন মিনিটে বুড়ির বাড়ি পৌঁছনো যায়। পায়ে হাঁটা পথ, পদো হয়তো ঐ পথে ভাত নিয়ে যায়।

নদীর কি রূপ এখানে। ওপার দেখা যায় না। জোয়ার এলে নদীর বাঁক মস্ত এক সাগর হয়ে থাকে ; তার আরম্ভ নেই, শেষ নেই। জল ফুলে ফেঁপে গুম্-গুম্ করে পাড়ির ওপর আছড়ে পড়ে। ফেণা ওড়ে ; এই ঘর থেকে দেখা যায়। ঠানদিদি আশ্চর্য সব গল্প বলে। সেকালের জলদস্যুদের কিংবদন্তী। ঠাকুর-দেবতায় বেজায় বিশ্বাস ; যেমন ভক্তি ফিরিঙ্গি কালীর প্রতি, তেমনি ভক্তি মারিয়া-মায়ের প্রতি। খৃশ্চান হিন্দু তফাৎ বোঝে না। আকাশের সব তারানক্ষত্র চেনে, এদিককার ইতিহাস ওর নখাগ্রে। অথচ পরীদের গল্পে গভীর বিশ্বাস। নাকি পূর্ব পুরুষরা এখানে টিকতে না পেরে বঙ্গোপসাগরের বুকে একটা সুন্দর দ্বীপে রাজ্য পত্তন করেছিল। বুড়ি-ই নাকি তার একমাত্র ওয়ারিশ। ওকে নিতে তাই চোদ্দডিঙা আসবে যে কোনো দিন। বুড়ি তৈরি। পা বাড়িয়ে আছে। তাই রোজ রাতে নিরাপদের সাদা বাতি দেয়। বিপদ দেখলে লাল বাতি দেবে ; অমনি নৌকো ফিরে যাবে। আবার যখন ভালো সময় আসবে ওকে নিতে আসবে জিনিসপত্র তৈরি, নৌকোয় তুলতে আধ ঘণ্টাও লাগবে না।

শুনলেও কষ্ট হয়। কোনো মৎলবী লোক নিশ্চয় ওকে এসব বুঝিয়েছে ওখান থেকে সরাবার জন্য। হয়তো কিছু দেখে থাকবে বুড়ি। 'ফিলিস্' জাহাজের অদৃশ্য সোনা নিশ্চয় জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে ডুবুরি দিয়ে তুলে নেওয়া হয়েছে। এই গ্রামের লোকরা অনেকেই ডুবুরির কাজ জানে, পদোর কাছে শোনা। তাদের হাতে বুড়ি পড়লে একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে।

সে রাতে কারো ভালো ঘুম হল না। কখন জোয়ার এসে গুম্-গুম্ করে পাড়িতে আছড়াতে আরম্ভ করেছিল। সেই শব্দ শুনে এক ঘুম দেবার পর গুপি-পানু জানালার কাছে এসে দাঁড়াতেই, তাদের চক্ষুস্থির! এ কি স্বপ্ন দেখছে, না সত্যি ? বুড়ির ঘরে সাদা

আলো ঝুলছে। জোয়ারের ফেণা উড়ছে আর অনেক দূর থেকে সেই উদ্দাম-উজান জলের স্রোতে ভেসে আসছে সব কটি সাদা পাল তুলে চোদ্দ-ডিঙা। অথচ এই স্রোতে পালের কোনো দরকার ছিল না। ফিকে তারার আলোয় সব দেখা যাচ্ছিল, যেন পরীদের দেশের কোনো দৃশ্যের মতো। আরো অনেকটা জোয়ারের জল পেরিয়ে তবে পাথরের আংটায় সেকাল থেকে ফিরে আসা নৌকোটাকে বাঁধা যাবে। সে জায়গাটা পাড়ির পেছনে আড়াল হয়ে আছে। কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেল কোনো কিছুই বুড়ির চোখ এড়োয়নি। সাদা লণ্ঠনের আলোয় ঠানদিদি একটা ছোট তোরঙ্গের ভারে নুয়ে পড়ে, পাড়ির পথ দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

আর কি গুপি-পানু ঘরে থাকতে পারে। বাইরের সিঁড়ি দিয়ে পড়িমরি করে ওরা ছুটল নৌকো আসা বন্ধ করে বুড়িকে বাঁচাতে। কিছু বলে যে তাকে বোঝানো যাবে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিন মিনিটে বুড়ির ঘরের সামনে পৌঁছে ওরা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দু-মিনিট পরেই ঘোরানো সিঁড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা গেল মাঝ-নদীতে চোদ্দ-ডিঙা থমকে থেমে আধা অন্ধকারে ঝিমঝিম করছে।

তারপরেই জোয়ারের মাথায় চেপে অসম্ভব বেগে উজানে পাড়ি দিল। যেতে যেতে ঝপ্-ঝপ্ করে পালগুলো পড়ে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের খাঁড়ি থেকে এক সারি মোটর-বোট পিছু নিল। হয়তো তাই দেখেই হাঁচড়-পাঁচড় করে চড়াই বেয়ে উঠে এসে, হতাশায় ভরা ভাঙ্গা গলায় ঠানদিদি চেচিয়ে উঠল, "কে-ও? কে-ও? কে ওখানে?" সে স্বর শুনে ভয় লাগে। গুপি-পানুর গায়ে কাঁটা দিল।

উত্তর দিল অন্য লোকে, চেনা গলায়, 'আমরা! আমরা! আমরা! পিরু তোমার দিন ফুরিয়েছে—এই রঘু, পিল্লে, জনার্দন, ধর ওকে, একজনের কম্ম নয়।' বিশ্রী একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি ফোঁশ-ফোঁশানি, চাপা গর্জন, তারপর ক্লিক্ করে কার হাতে হাতকড়া লাগল। সব চুপ।

নদী-পুলিশের সেই ওস্তাদরা! সঙ্গে মিঃ সমাদ্দার, ডাঙার পথে জিপে এসেছেন সন্দেহ নেই। একটা জোরালো টর্চের আলোতে দেখা গেল বড়-ঠানদিদিকে চারজন লোক জাপ্টে ধরে রেখেছে। ঠানদিদি রাগে ফুঁশছে, চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, হাতের পেশীগুলো নিস্ফল আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছে। ঠানদিদির হাতের পেশী? ঘোমটা খসে গেছিল। একি সত্যি ঠানদিদি?

ওদের ওপর চোখ পড়তেই ঠানদিদি বলল, "ফিরে এসে তোদেরো দেখিয়ে আনতাম রে দাদা। সেখানে সবাই খেতে পায়। গরীব নেই সেখানে রে।" পানুর গলায় ব্যথা করতে লাগল।

তারি মধ্যে মেজদাদু চেঁচিয়ে উঠলেন, "পিরু! পিরু না? তোর সঙ্গে গাছে চড়িনি? ওরে পিরু, তুই তাহলে বেঁচে আছিস্! তাহলে তোর যমজ বোন ঠানদিদি কোথায় গেল?"

পিরু মুখ তুলে বলল, "মারিয়া-মা তাকে তুলে নিয়েছেন। শেষটা তুমি লাল বাতি দেখিয়ে আমাকে ডোবালে, দাদা?" মেজদাদু ওর কাছে এসে বললেন, "না, না, নারে। তুই নিজেই লাল সংকেত দিয়ে তাদের সাবধান করে দিলি! বড় ঠানদিদি মরেনি। সে মলে চোদ্দ ডিঙা কে চালাচ্ছে? দু'মিনিটে অত পাল কে নামাল?" পিরু তখন হাত-কড়া লাগানো দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। "বিশ্বাস কর, আমিও লাল-বাতি দেখাইনি! নিশ্চয় মারিয়া-মা দিয়েছেন।"

এমন সময় গুপির কানের কাছে কে বলল, "ইয়ে, কিছু খাবার-দাবার আছে?" গুপি পকেট থেকে এক মুঠো কাজু-বাদাম বের করে ছোটমামার হাতে দিয়ে বলল, "এত সর্বনাশের পেছনে যে তুমি আছ, সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল।"

আরো পরে নদী-পুলিশের জিপে করে তাদের লোকদের সঙ্গে পিরু আর মিঃ সমাদ্দার বিদায় নিলে, মেজদাদুর বাড়িতে চায়ের টেবিলে বসে ছোটমামা বললেন, "তাহলে তোমার কাছে পুলিশগুলোকে পাঠিয়ে বুদ্ধি করেছিলাম বল। তুমি ঠিক আঁচ করেছিলে বুড়ির ঘরে সোনা লুকোনো। কি করে মনে হল?"

মেজদাছ বললেন, "আমার মনে হয়নি। গুপি-পান্নু যেই বলল বুড়ির বাক্সে রাঁধাবাড়ার জিনিসপত্র ঠাসা, অমনি সব পরিস্কার হয়ে গেল! বুড়ির থালা গেলাস পর্যন্ত এবাড়ি থেকে যায়, ওর বাক্সে তো ও-সব থাকার কথা নয়। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা হল যে পিরুকে চিনতে পারলাম না! ষাট বছর আগে একটা নৌকোকে আমরা ঐ রকম চোদ্দ-ডিঙা সাজিয়েছিলাম। ওপরটা ভারি হয়ে গেছিল। খালি পিরু আর ওর যমজ বোন, বড় ঠানদিদি—আশী বছরের বুড়োর সঙ্গে পাঁচ বছর বয়সে ওর বিয়ে হয়েছিল, একমাস পরে বিধবা হয়েছিল, এমন ডানপিটে মেয়ে ছেড়ে দাও, ব্যাটাছেলেও দেখিনি—আর আমি ওটা চালাতাম। একবার ঝড়ে ভেঙে গেল! এ যেন ঠিক সেই। পিরুটা যদি শেষ বয়সে জেলে যায়! মনটা খারাপ হয়ে আছে।"

বলা বাহুল্য ঠানদিদির ঘরের বাক্স-প্যাঁটরার জিনিসের তলায় সোনাগুলো ঠাসা ছিল। সব উদ্ধার হল। সমাদ্দার কোম্পানি প্রশংসা, পুরস্কার, অনুদান সব পেল। বে-আইনী সোনা উদ্ধার করার জন্য পিরু বে-কসুর খালাস তো পেলই, উপরন্তু সরকার ঘোষিত টাকা-কড়িও পেল। তার পক্ষে একশো সাক্ষী দাঁড়িয়েছিল। সবাই মেজদাছর চেনা, ভালো লোক।

চোদ্দ-ডিঙারো কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তবে তিন কিলোমিটার উজানে একটা খাঁড়ি। খাঁড়ির ধারে একটা অকেজো রকমের লম্বা মাছ-ধরার নৌকো, ডাঙার ওপর কাৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। তারি পাশে কাঠ-গুদাম; কাঠ গুদামের মালিক এক বুড়ি। পাৎলা পাৎলা কাঠ দিয়ে সে কি সুন্দর পাল তোলা জাহাজ বানাত সে আর কি বলব। গুদোমের কাঠের সে কি যত্ন! কাঠের গাদার নিচে অনেকগুলো বড় বড় ক্যাম্বিশের টুকরো পাতা থাকত। একটি মাত্র ভাই ছাড়া নিজের বলতে বুড়ির কেউ ছিল না।

এসব হল গিয়ে অনেক দিন পরের কথা। সে দিনের সকালের ঐ চায়ের আসরে ছোটমামা বলেছিলেন, "সব ভালো যার শেষ ভালো। একটা রহস্য খালি বোঝা গেল না। ঐ লাল বাতির বিপদ-

সংকেতটা কে দিয়েছিল ?'

পান্নু মুখ হাঁ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গুপি তার কোঁকে এমনি খোঁচা দিল যে "ই—ই—ই—ক্" করে সে থেমে গেল।

সমাদ্দার ইনভেষ্টিগেশনস লিমিটেড

নাকি রাতে পৌঁছলেই ভালো, যাতে কেউ দেখতে না পায়। যাওয়াও খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়; প্রথমে লড়ঝড়ে বাস, তারপর নৌকো। সে যা নৌকো সে আর কহতব্য নয়। তবে বিনা পয়সার ব্যবস্থা, অন্য লোকে সব ঝামেলা পোয়াচ্ছে, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ভালো; কাজেই কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু খালেতে নদীতে কুমীর নাকি থিক থিক করছে।

ব্যবস্থা তো যথা সম্ভব ভালো হবেই, কারণ যারা সে সব করছে তাদেরি গরজ। তবু বড় বেশি সরু খাল দিয়ে নৌকো তিনটে চলেছিল। থেকে থেকে জলে ঝপাং করে কিছু পড়ছিল। নাকি বেশ গভীর; পলেই হয়ে গেল। দু পাশের গাছগুলোর ডালে ডালে ছোঁয় আর কি। যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ। ছোটমামা শেষ অবধি থাকতে না পেরে বললেন 'বাবাঃ, গা শিরশির করে।' পাশের লম্বা-চুল পান-খাওয়া ছোকরা দাঁত বের করে হেসে বলল, 'তা করবে না, এটা যে ইতিহাসের শ্মশান।' তার পাশের লোকটা বলল, 'কিম্বা আশা-ভরসার গোরস্থান' এখান থেকে গঙ্গা-সাগর অবধি কম করে ২৪২টা জাহাজ ডুবির লিখিত প্রমাণ আছে।'

ছোটমামার আপিসের চৌধুরী সাহস দিয়ে বলল, 'ও কিছু না, আগে এ-সব জায়গায় নরবলি হত। আগের ঘাটটার নাম নৃমুণ্ডের ঘাট।' চৌধুরীর ওপাশে ছোটমামাদের মক্কেল বটুকবাবু বললেন, 'আর বাঘের পেটেই কি কম গেছে।' মক্কেল চৌধুরীকে চেনে না। ওদের আপিসের কেউ অন্য কারো মক্কেল চেনে না। ছোটমামা

একটু রাগরাগ ভাব করে বললেম, 'দিনের বেলা এলেই হত। এরকম রহস্যজনক ভাবে আসার মানেটা কি? ই—ইক!' লম্বা মতো কি একটা ফোঁস শব্দ করে ছোটমামার প্রায় গা ঘেঁসে জলের উপর দিয়ে ছুটে গেল। লম্বা-চুল বলল, 'ভয় পেলেন নাকি? ও কিছু না, ও নোনা জলের ভোঁদড়, মাছ খেয়ে ওদের পেট ভরে না, বড় জানোয়ারও খায়।'

পারলে ছোটমামা হয়তো নৃমুণ্ডের ঘাটেই নেমে যান আর কি। বটুকবাবু শাঁসালো মক্কেল, তাঁকে অবিশ্যি চটালে, সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সের কর্তা এবং মালিক মিঃ সমাদ্দার কি করতে কি করে বসবেন। ছোটমামার চাকরি রাখা দরকার, দুবছর পুরো হলে, সার্টিফিকেট পাবেন, তখন সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে ঢুকবেন।

নৌকোতে আরেকজনও ছিল, যে একটাও কথা না বলে নাক অবধি কাশী সিল্কের চাদরে জড়িয়ে পানুর গা ঘেঁসে বসেছিল। নাকি চৌধুরীর কে হয়, পিলুদা নাম, তবে তার সঙ্গে কথা বলতে চৌধুরী মানা করে দিয়েছেন। সে লোকটা গুপির কানে কানে বলল, 'কেয়ার-ফুল। বটুক একটি ঘুঘু! কিছু ফাঁস না করাই ভালো।' শুনে গুপি হাঁ, পুজোর ক দিন আমোদ করতে এসেছে, ঝুমুরদহের আশে পাশের দশ বারোটা বনগ্রাম নিয়ে পাঁচ বছর অন্তর এ অঞ্চলে একবার করে গিরীশচন্দ্র নাট্য প্রতিযোগিতা হয়। সে এক এলাহি ব্যাপার। নিয়ম কানুন খুব সহজ। এই অঞ্চলে পাঁচ-পুরুষের বাসিন্দা হওয়া চাই আর একই লেখা নাটক সবাইকে করতে হবে। এ বছর নাকি এ-অঞ্চলের নাম-করা ব্যবসাদার ফটিক সরকারের রাবণবধ, পালা হবে। এক মাস আগে থাকতে 'হিট' শুরু হয়েছে, ফাইনেল হবে বিজয়ার পরদিন। শেষ প্রতিযোগিতা ঝুমুরদহের সঙ্গে কালিয়া গ্রাম এক দিনেই দুবার নাটক হবে, একই বিচারক মণ্ডলী বিচার করছেন। তাঁদের সঙ্গে শুধু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পছন্দ করা বাইরের দুজন প্রধান বিচারক ফাইনেলে থাকবেন। ছোট মামাদের বস ঝুমুরদহের স্বার্থরক্ষার জন্য ছোটমামাকে আর কালিয়াগ্রামের জন্য চৌধুরীকে আলাদাভাবে

পাঠিয়েছেন। আলাদা বলা হল এইজন্য যে বটুকবাবু যে ছোটমামাকে এনেছেন সেটা পিলুদা জানে না, আবার পিলুদা যে চৌধুরীকে এনেছেন সেটা বটুকবাবু জানেন না। দুজনেই সমাদ্দারের মক্কেল। সমাদ্দার বলে দিয়েছেন যেন উভয় দিক রক্ষা হয়। এর মধ্যে সমস্যাটা কোথায় গুপি পানুর কেউ বুঝতে পারছিল না। তবে হ্যাঁ উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পদক পাইয়ে দেওয়া একটু শক্ত।

নৃমুণ্ডের ঘাটে চৌধুরী পিলুদা আর গুপি নেমে যেতেই বটুকবাবু পা মেলে দিতে দিতে বলল, 'বাবা, এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ও ব্যাটা থাকতে একটা কথা বলতে পারছিলাম না। বুঝলেন চাঁদুবাবু, আমি টিকটিকি এনেছি খবরদার ফাঁস করবেন না। সমাদ্দার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন সব সমস্যার সমাধান করেন আপনারা। যেমন করে পারেন ঝুমুরদহকে গিরীশ পদকটা পাইয়ে দিতে হবে। গতবার কালিয়াগ্রাম পেয়েছিল সেই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। জানেন মুরলীর মেয়ের বিয়েতে ঝুমুরদহের লোকদের আলাদা বসিয়েছিল।' ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার মশাই, খুলে বলুন তো।' 'কি আবার ব্যাপার—ঝুমুরদহের যে লোকটা রাণী সাজে তার তুলনা হয় না, কিন্তু রামটা ক্যাবলার এক শেষ, খালি ষাঁড়ের মতো চ্যাচায়, অথচ ওর বাবা পূজো কমিটির চাঁই।' ছোট মামার কানদুটো অমনি খরগোশের কানের মতো খাড়া হয়ে উঠল। 'আর কালিয়াগ্রামের দল?' বটুকবাবু হাসলেন, 'ওদের রাম ভালো হতে পারে, কিন্তু রাবণটা যেন ভাঙ খায়, সদাই ঝিমুচ্ছে।' 'আর হনুমানরা?' প্রশ্ন শুনে বটুক অবাক হলেও, পানু খাড়া হয়ে উঠে বসল। ব্যস্, আর ভয় নেই, ছোটমামার বুদ্ধি খুলেছে। বটুক বাবু বললেন হনুমানই নাকি ভালো। আরে সবাই তো একই গাঁয়ের ছেলে। নৃমুণ্ড ঘাট হাইস্কুলে সবাই পড়ে; ওদের হেডমাস্টার আগে অ্যাকটর ছিল, সে-ই শেখায়। কিন্তু গাঁয়ের নিজের দল নেই। মোড়লের গুরুর বারণ আছে। তার ছেলে বখে যাবার ভয়।

এই অবধি শুনে ছোটমামা নোট বুকে কিছু লিখে রাখলেন। উত্তেজনায় পানুর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। বটুকবাবু বললেন

'আপনার পরিচয়টা দাদা ঐ পিলু হতভাগাকে দেবেন না। ও ব্যাটা ক্যায়সা চালাক দেখলেন? কোত্থেকে এক ছুঁচোমুখো ধরে এনেছে দেখলেন? ভাবছে বুঝি সার্ট পেন্টেলুন পরালেই শেয়াল চেনা যাবে না! ছোট ছেলেটাকে পর্যন্ত দলে ভিড়িয়েছে, ওকে দিয়ে দুস্কর্ম করাবে নিশ্চয়ই।' পানু আপত্তি করতে যাচ্ছিল, ছোটমামার চিমটি খেয়ে 'উঃফ' বলে থেমে গেল।

বটুকবাবু বললেন, 'কি হল?' তারপরে নৌকোর ঝোলানো লণ্ঠনের আলোতে পানুকে ভালো করে দেখে নিয়ে, খুশি হয়ে বললেন, 'ঠিক হয়েছে। আপনার ভাগ্নেটির কি রকম কচিপনা মুখ, ওকে দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে।' ছোটমামা বললেন, 'শ্-শ্ লণ্ঠনেরও কান আছে। ওসব কথা পরে হবে।'

একটা ভালো যে নৌকোর ঘাট থেকে বটুকবাবুর বাড়ি বেশি দূরে নয়। আম জাম সুপারি গাছের বনের মাঝে একটা কোঠা বাড়ি, বাকি টিনের চালের পাকা ঘর। আগুনের ভয়ে এদিকে কেউ নাকি খড়ের চাল করে না। ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি, এসব জল-ঝড়ের দেশেও দাবানল হয় নাকি?' বটুকবাবু নাক দিয়ে ফোঁস শব্দ করে বললেন, 'দাবানল কেন হবে? গৃহ-প্রস্তুত আগুন মশাই, এই নাটকের ব্যাপার নিয়েই যেমন হতে পারত। কালিয়া গ্রামের এমনি আস্পর্ধা যে অত ভালো রামটাকে আগে থাকতেই বাগিয়ে নিল। ওদের যদি একদিন'—ছোটমামা ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে বললেন, 'শ্-শ্ অত উত্তেজিত হবেন না। সে এতক্ষণে গায়েব হয়ে গেছে।" বটুকবাবু সঙ্গে সঙ্গে মুচ্ছো গেলেন।

সুখের বিষয় ওঁরা ততক্ষণে দালানের দোর গোড়ায় এসে গেছিলেন, বটুক কাজেই তখুনি উঠেও পড়লেন। উঠেই ছোটমামার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের জায়গাতে মাথা ঠুকতে লাগলেন। লাগল কিনা কে জানে। ছোটমামা বললেন, 'সমাদ্দার সাহেবের পরিকল্পনাতে কোনো খুঁত থাকে না, মশাই। আপনারা গিরীশ পদক না পেলেই আশ্চর্য হব। কিন্তু এখন মুখে চাবি! সমাদ্দারের চররা ইতিমধ্যে কাজে লেগে গেছে'।

মশালের আলোতে কূয়োর ধারে ঠাণ্ডা জলে স্নান, এই মুস্কো চেহারার দুটো লোক গায়ের ওপর হুড়-হুড় করে জল ঢেলে দিল। তারপর চিনি দিয়ে জ্বাল দেওয়া এক বাটি করে ঘন দুধ খাওয়া। বটুকবাবু বললেন সূর্যাস্তের পর চা খেলে নাকি ম্যালেরিয়া হয়। ওদের জন্য আলাদা একটা সুন্দর ঘর দেওয়া হয়েছিল, বাঁশের দেয়াল লাল টালির ছাদ। রাতে খাবার আগে সেখানে বটুকবাবু আর সেই লম্বা চুল, পান খাওয়া ছোকরা, তার নাম বেন্দা, আর তার পাশের কালো লোকটা, তার নাম কেষ্ট, এরা সবাই এল। এরা নাকি নাটক করবে। অমনি ওরা নাটকের পার্ট বলতে আরম্ভ করে দিল! সে কি ভালো অ্যাক্টিং, পানু শুনে অবাক। একশোবার মহড়া দিয়ে আর একই নাটক শুনে সব পার্ট সবার মুখস্থ। হঠাৎ বটুকবাবু সোনার চেন ঘড়ি দেখে বললেন, 'ন'টা বেজে গেছে এঁ্যা! পদু এল না কেন?'

ঠিক সেই সময় উঠি পড়ি করতে করতে ছুটে এসে একটা বেঁটে মোটা লোক সেখানে আছড়ে পড়ল, তার বুকটা হাপরের মতো উঠছে পড়ছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে, বড়কর্তা; পদুকে পাওয়া যাচ্ছে না।' পানু উঠে এসে বলল, 'বাঘে নিল বুঝি?' সে লোকটা রেগে গেল, 'বাঘে নিবে কি! কাগজ পড় না? মাত্র সাতচল্লিশটা বাঘ বাকি আছে, তাদের অনেকেই নিরামিষ খায়, এই হরিণ টরিন। বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্করে নিয়েছে!'

বটুকবাবুর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। 'কি হবে মশাই? সর্বনাশ হয়ে গেল যে।' ছোটমামা মুচকি হেসে বললেন, 'কোনো চিন্তা নেই। রাত হয়েছে, ক্ষিদে পেয়েছে।' 'কিন্তু—কিন্তু—গিরীশ পদক—' 'এতে কোনো কিন্তু কিন্তু নেই! বলছি তো গিরীশপদক পেয়ে যাবেন। গোলমাল করে সব পণ্ড করবেন না।'

দিব্যি খাওয়া হল। আটার লুচি, বেগুন ভাজা, পাঁঠার কালিয়া, কুলের চাটনি, পায়েস। খেয়েই ঘরে এসে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ছোটমামা শুয়ে পড়লেন। ঘুমোবার আগে শুধু

বললেন, 'চৌধুরী, গুপি এদের আমরা চিনি না, মনে থাকে যেন।'

কি করে দিনগুলো কাটল পানু ভেবে পেল না। কোনো লুকোনো জায়গায় রোজ নাটকের মহড়া হত। ছোটমামা ঘরে বসে কি-সব পরামর্শ দিতেন। সকলের সে কি উত্তেজনা। কালিয়া গ্রামে কি হচ্ছে কে জানে। তাদের সেরা অভিনেতা আগেই গায়েব হয়েছে। ঝুমুরদহই বা বিনা রামে কি করছে কে জানে।

দেখতে দেখতে পূজো হয়ে গেল, সে কি ঘটা, সে কি বাজনা বাদ্যি, সে কি খাওয়া-দাওয়া, এই বড় বড় পোনা মাছের চাকলা, সে আর ভাবা যায় না। বিজয়ার দিন ঝুমুরদহের বড় বিলে ঠাকুর ভাসান হল। নদীতে খালে ভাসান দিলে জোয়ারের জলের সঙ্গে ভাসা ঠাকুর ফিরে আসে। মা ঠাকুমারা কান্নাকাটি করেন, তাই এই ব্যবস্থা।

তারপর সেই বহু-প্রত্যাশিত একাদশীর সন্ধ্যা এল। প্রায় সারা রাত নাটক হবে। সাতটা থেকে দশটা এক দলের অভিনয়! একটা মহারানী ভিক্টোরিয়ার মুখ দেওয়া মোটা রূপোর টাকা ছুঁড়ে ঠিক হল কারা আগে অভিনয় করবে। যেমন প্রত্যেকবার হয়ে এসেছে।

বড় চাঁদমারির মাঝে প্রকাণ্ড কানাতের নিচে অভিনয়। এক মাস ধরে কানাত পড়েছে। সব অভিনয় এখানে হয়েছে। ফুটবল খেলার মতো জোড়ায় জোড়ায় বাছাই হয়ে, এই শেষ দুটিতে দাঁড়িয়েছে। গিরীশ ঘোষই এই ব্যবস্থা করে গেছিলেন। ফুটবলের মাঠেও তখন এ ব্যবস্থা হয় নি। কে জানে ওঁর কাছেই ওরা শিখেছিল কি না।

কালিয়াগ্রাম টসে জিতে আগে অভিনয় করল। পানু দেখল ওদের পাণ্ডাদের দলে মেনি বেড়ালের মতো মুখ করে চৌধুরী আর গুপি বসে যখন তখন মিছিমিছি হাততালি দিচ্ছে। দেখে রাগে গা জ্বলে গেল। তবু স্বীকার করতেই হবে যে অভিনয় ভালো হয়েছিল। প্রত্যেকটি অ্যাকটর ভালো অভিনয় করেছিল। রাবণের জয়-জয়কার, কি তেজ, কি গর্ব, আকাশ-বাতাস গুম-গুম করতে থাকল। মরবার সময়ও রাবণ বুকে কীল মেরে হা—হা করে হেসে মল। সকলের রক্ত

টগবগ করে ফুটতে লাগল। দলে দলে লোক মেডেল পুরস্কার ইত্যাদি ঘোষণা করল। কে একটা রাম সেজেছিল কেউ চেয়েও দেখল না। তারপর যে যার আস্তানায় ফিরে গিয়ে খাওয়া। তারপর সাড়ে এগারোটায় ঝুমুরদহের দল মঞ্চে উঠল।

রাত বেড়েছে, চারিদিক থম্ থম্ করছে। উঁচু উঁচু গাছ থেকে বড় বড় ফোঁটায় হিম পড়ছে, যেন গাছরা মনের দুঃখে কাঁদছে। একই দৃশ্য, একই কথা, তবু মনে হতে লাগল যেন একেবারে নতুন একটা নাটক হচ্ছে। তার বাহাদুর রাবণ নয়, সে রাম। সে কি দুঃখ সে কি ব্যথা, সীতা হারানোর সমস্ত হতাশা দলা পাকিয়ে মেঘ হয়ে মঞ্চের ওপর জমা হয়ে রইল। দর্শকরা কেঁদে কেটে একাকার। কে রাবণ সাজল সে কথা কারো মনেও হল না পিলুদা গোড়ায় দুবার শেম শেম বলে চ্যাঁচালেও শেষে হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন। সেই যথেষ্ট। তাছাড়া ওদের অভিনয়ের সময় বটুকবাবুও দুবার পচা টমেটো ছুঁড়ে ছিলেন ভুলে গেলে চলবে না। রাত আড়াইটায় নাটক শেষ হলে, চারদিকে চুপচাপ, কারো মুখে কথা নেই। রাবণ মরে গেছে, তবু সীতার দুঃখ ঘোচে নি, রাম কড়া কথা বলেছেন। কে কি বলবে? কার কি বলার আছে?

এমন সময় জেলা কমিটির সভাপতি নিজে উঠে চিৎকার করে ভাঙ্গা গলায় ঘোষণা করলেন, 'এ বছরের গিরীশ পদক একটির জায়গায় দুটি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পদকের খরচ সরকার বহন করবেন।' এই বলে দু-একবার চোখ নাক মুছে বসে পড়লেন। তখন সে কি আনন্দ, সে কি উল্লাস! বটুকবাবু পিলুদাকে বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করলেন! শোনা গেল ওঁরা নাকি ভায়রাভাই, অর্থাৎ ওঁদের স্ত্রীরা দুই বোন। সেই বিপুল আনন্দোল্লাসের মধ্যে সেই গায়েব হওয়া দুই অ্যাকটরের কথা লোকে ভুলেই গেল। দেখা গেল তারাও এসে চোখে মুখে কিছু কিছু রং-মাখা অবস্থাতেই বেজায় নাচানাচি করছে। তাই দেখে গুপি পানু ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারল না। তার পর দিন সবাই বেলা দশটা অবধি ঘুমিয়ে ওঠে, কলকাতার দল ফিরবার জন্য গোছগাছ

করতে লাগল। বিচারক মণ্ডলীর, সভাপতি ও সহ-সভাপতি নাকি বর্ধমানে থাকেন ; তাঁরা চা জলখাবার খেয়েই জেলা কমিটির মোটর বোটে চড়ে বিদায় নিলেন। বাকিরা দুপুরের ভূরি ভোজের পর আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় নৌকোয় উঠলেন।

স্থানীয় লোকদের তখনো অনেক কাজ বাকি, কানাত তোলানো, কর্মী বিদায়, হিসাব মেটানো ইত্যাদি, কাজেই ছোটমামা তাঁদের সঙ্গে যেতে বারণ করলেন। প্রথম নৌকোটিতে রইলেন ছোট মামা, পানু, চৌধুরী, গুপি আর ডেকরেটর কোম্পানির চারজন ভদ্রলোক। দিনের বেলা খালের অন্য চেহারা। কত বাড়ি ঘর।

একটু পরেই পানু বলল, 'আমাদের রাবণ গায়েব হয়ে কোথায় গেছিল ?' চৌধুরী বলল, 'কেন, সে আমাদের রাবণ হয়েছিল। গুপি বলল, 'আর আমাদের রাম ?' ছোটমামা বললেন, 'সে আমাদের রাম হয়েছিল। আর আমাদের রাম আমাদের রাবণ হয়েছিল আর তোমাদের রাবণ তোমাদের রাম হয়েছিল। হবে না কেন ? সবার সব পার্ট মুখস্থ, ক্ষতিটা কি হল ? সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্স দুজনকেই গিরীশ পদক পাইয়ে দেবে বলেছিল, দিয়েছেও তাই। তবে—'

গুপি পানু এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল। 'তবে কি ? চৌধুরী বলল, 'ঐ পিলুদা আর ঐ বটুকবাবু দুজনেই গোপনে যদি মিঃ সমাদ্দারকে বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি আর ওঁর শ্যালাকে সহসভাপতি না করত তা হলে শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না। যাই হক, সব ভালো যার শেষ ভালো।'

———

দ্বিতীয় টিকটিকি

ডিমাপুর থেকে ছোটমামা হঠাৎ গুপিকে তার করল, 'কাম সার্প।' আগেও গুপি একবার ডিমাপুর গেছিল, খুব ভাল লেগেছিল। পাহাড়ি জায়গা, চারদিকে ঝাউগাছ আর চা-বাগান। রাতে ঝোপে ঝাড়ে হাজার হাজার জোনাকি, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে কান ঝালাপালা. মুরগি, মুরগির ডিম, ঝর্ণাবনির মাছ আর বুনো স্ট্রবেরি।

বড়মামুর বন্ধু অনন্তমামার চা বাগান। ঐ বাড়িটাতে কেউ বারোমাস থাকে না। মাঝে মধ্যে ছুটিছাটাতে যায়। বড় বড় ঘর; কাঠের মেঝেতে নারকেল ছোবড়ার গালচে পাতা তাতে পিসু হয়। পিসু এক রকম ছোট পোকা, দেখা যায় না। বেজায় কামড়ায়। চৌকিদার আছে, বেজায় ভালো রাঁধে আর ফটকের পাশে আলু-বখরার গাছটার তুলনা হয় না।

পূজোর ছুটি, গুপির যেতে কোন বাধা নেই। নিশ্চয় এর মধ্যে একটা কিছু ঘোরেল ব্যাপার আছে, নইলে 'কাম সার্প' কেন? গুপি মহাখুসি। সেই নেপোর ব্যাপারটা চুকে যাওয়া ইস্তক শুধু পড়া। এই দেড় বছরে ছোট মামা পর্যন্ত সত্যি সত্যি বি-এস-সি পাস করে ফেলে, সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে দ্বিতীয় টিকটিকির চাকরি পেয়েছে। একটু হাত পাকলে বিনু তালুকদার ওকে পুলিশে ঢুকিয়ে নেবে।

এই সময় ছোটমামার ডিমাপুরে থাকার কথা নয়। আপিসে সব চেয়ে কম মাইনে পেলে কি হয়, আসলে সে সমাদ্দার সাহেবের ডানহাত। যত ক্রুর তদন্ত সব ওদের দ্বিতীয় টিকটিকিকে দেওয়াই নিয়ম। কারণ প্রথম টিকটিকির মুখ চিনতে কোনো নিয়মভঙ্গকারীর আর বাকি নেই। এদিকে ছোটমামার নাম পর্যন্ত ওদের খাতায় লেখা নাই। এমন কি অন্য কর্মচারীদের মধ্যেও অনেকের ধারণা যে ছোটমামা

সমাদ্দারের একজন মক্কেল। এই রকমই দরকার। দ্বিতীয় টিকটিকি আছে কি নেই কেউ জানবে না, আর মাঝখান থেকে সে-ই তদন্ত চালিয়ে সব ফাঁস করে দেবে। কিন্তু তখনো তার নাম উহ্য রাখা হবে। সবাই সমাদ্দারের বুদ্ধির তারিফ করবে। এই নিয়ে ছোটমামা গুপির কাছে অনেক দুঃখও করেছে, এবারও নিশ্চয় কোনো বিপজ্জনক কাজ নিয়েই ওখানে গেছে। বাড়ির লোকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না! কারণ সমাদ্দারের আপিস বর্ধমানে। সেখানে এক জন ভালো হাত-আয়না ও লজেঞ্চুষ-ওয়ালার সঙ্গে ছোটমামা থাকে। ওর নামটি পর্যন্ত কেউ জানে না। সবাই ওকে ম্যালেরিয়া বাবু বলে ডাকে। তাদের বিশ্বাস ছোটমামা কোনো খবরের কাগজের মফঃস্বল রিপোর্টার। চেহারা দেখেই ম্যালেরিয়া রুগী বলে বোঝা যায়।

ছোটমামার এ সব বিষয়ে কোনো দুঃখ নেই। ভালো টিকটিকিদের তো এই রকমই হতে হয়। ভিড়ের মধ্যে তাদের আলাদা করে চেনা যাবে না। চোরদের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেও কিছু মালুম দেবে না! রোগা লিকলিকে চেহারা, তার উপর ভীতুর একশেষ; বেড়াল দেখলে লোম খাড়া হয়। আরশুলার শব্দ পেলে ভির্মি যায়, একবার শিষ্য-গুরু প্যাঁচার ডাকে হাত পা এলিয়ে গেছল। দ্বিতীয় টিকটিকি সাহস বা গায়ের জোর দেখিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কেন? তার কাজ আড়ালে, অজ্ঞাত থেকে ছোঁক ছোঁক করে অন্যায়কারীদের হাঁড়ির খবর বের করে আনা। কাঁচা কাঁচা প্রমাণ লাগানো।

এইজন্যেই নিশ্চয় ডিমাপুর যাওয়া। কোনো জটিল তদন্ত ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও বাড়ির লোকেদের ধারণা অন্যরকম। মা বললেন, 'যাক্ তবু যে অনন্তবাবুদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর জায়গায় গেছে, তাও ভালো।' দাদু বললেন, 'ভালো জায়গায় সৎসঙ্গে থাকা এখন সহ্য হলে হয়।'

এদিকে গুপি খুব ভালো করেই জানত যে অনন্তবাবুরা বড় মামাদের সঙ্গে রামেশ্বর গেছেন। তবে বড়দের কথার মধ্যে থাকার কি দরকার এই ভেবে চুপ করে রইল! তাছাড়া কিছু বললেই তো হয়ে গেল।

ছোটমামা বেচারি একলা অকুস্থলে ম্যানেজ করতে পারছে না, একজন বিশ্বস্ত সহকারী দরকার, তাই না 'কাম সার্প'। এহেন অবস্থায় তাকে তো আর হতাশ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত বাবার তুষটাকে ছোট স্যুটকেসে ভরে ডিমাপুর রওনা।

ছোটমামা সেই পুরনো দাড়িটা পরে ছোট গাড়ির স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। ভাগ্যিস সেই নেপোর ব্যাপারের সময়ে দাড়িটা চেনা হয়ে গেছিল নইলে ছোটমামাকে চেনা গুপির সাধ্য ছিল না। বললে, 'এ সব ছদ্মবেশ খুবই সহজ, স্রেফ দু'গালে দুটো আস্ত সুপারি আর সামনের চুল ছোট, পিছনের চুল লম্বা। ব্যস, কোনো দুঁদে টিকটিকিও চিনতে পারবে না। দ্বিতীয় টিকটিকির আসল রূপ যত কম লোকে দেখে ওর উন্নতির পক্ষে ততই ভালো।'

হেঁটেই আসছিল ওরা, ওখানে গাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে? ঘোড়া অবিশ্যি ছিল। কিন্তু ছোটমামার 'হে ফিবার' কিনা, ঘোড়া দেখলেই হাঁচি আসে। তবে বেশি দূরও নয় আর গুপির লম্বা লম্বা হাঁটা দেওয়া অভ্যাস। পাহাড়ের গা কেটে বাজারের মাঠ। তার পাশেই খোলা মাঠ। সেখানে মস্ত একটা ছেঁড়া তাঁবু পড়েছে দেখা গেল। দূর থেকে দেখেই গুপির মহা উৎসাহ।—'ওকি ছোটমামা, সার্কাস নাকি? দেখাবে তো?'

ছোটমামা গুপির কোঁকে খোঁচা দিয়ে ফিস ফিস করে বলল—'স্-স্-স্, এক্ষুনি সব ফাঁস করে দিচ্ছিলি! ওটাই অকুস্থল, তদন্তের ক্ষেত্র। এখন চুপ কর দিকি, কে কোথায় শুনবে। বাড়ি গিয়ে সব বলব।'

কে কোথায় শুনবে শুনে গুপি অবাক। কোথাও তো জনমানুষের সাড়া নেই! অথচ সবে বিকেল পাঁচটা হবে। আরেকবার ভালো করে দেখতে গিয়ে গুপির হাত পা ঠাণ্ডা। দুটো গুণ্ডা চেহারার লোক ওদের পিছু নিয়েছে। 'ও ছোটমামা, গুণ্ডায় পিছু নিয়েছে যে।'

ছোটমামা চটে গেল। 'আহা, আবার গুণ্ডা কোথায় দেখলি। ও তো ছটু আর পালক। আমার বডিগার্ডই বলিস বা ফলোয়ারই বলিস।

ওরা সর্বদা সঙ্গে থাকে। নইলে দ্বিতীয় টিকটিকি গুমখুন হলেই হয়েছে। তদন্ত বন্ধ। তাছাড়া রাফ কাজ করার জন্যে তো লোক চাই। একলা হিংস্র—ঐ যা বলেই ফেলেছিলাম আরেকটু হলে। আমার আবার লোমের গন্ধে হাঁপ ধরে।'

গুপি বিরক্ত হয়ে চুপ করে রইল। কিন্তু শিরার মধ্যে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। আঃ, বিপদ কী ভালো জিনিস! প্রাণ হাতে করে পাহাড়ের পথে ঘুরে বেড়ানো। পিছনে ছট্টু আর পালক। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই ছট্টু আর পালক পা চালিয়ে ওদের ধরে ফেলল। দুজনেই একসঙ্গে বলল, 'চাঁদুবাবু, আজ আমি মাংস পরিবেশন করব।' ছোটমামা কোন উত্তর না দিয়ে, গেটের পাশের ছোট চোরা ফটক দিয়ে ঢুকে পড়ল।

চৌকিদার বসবার ঘরে দুটো বড় বড় তেলের বাতি জ্বেলে দিয়ে বলল, 'বড় সাহেব,আমার ভয় করছে। আমাকে দুদিনের ছুটি দিন। দিদিমার বড় বেমারি।'

সঙ্গে সঙ্গে ছট্টু আর পালকও বলল, 'আমাদেরও খরচা দিন। শেষটা কি বেঘোরে প্রাণ দোব ঐ বিকট ভাবে?'

ছোটমামা শুধু বলল, 'আগে খাওয়া দাওয়া হোক। তোদের অত ভয় কিসের রে? কালই সব চুকেবুকে যাবে।'

কিছুই বুঝতে না পেরে গুপি চারদিকে চেয়ে দেখল। জানালার কাচ দিয়ে দেখা গেল বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে। পাহাড়ের ছায়ায় ঘেরা এসব জায়গায় সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে অন্ধকার হয়। বুকটা একটু টিপটিপ করতে লাগল। থমথমে চুপচাপ। পাশের ঘরে চৌকিদার বাসনপত্র নাড়ছে, তার যা একটু শব্দ। হঠাৎ তারি মধ্যে দিয়ে খড়র খড়র করে করাত দিয়ে কাঠ চেরার মতো আওয়াজ হল। অমনি চৌকিদার মাংসের হাঁড়ি ফেলে ছুটে ছোটমামাকে জাপটিয়ে ধরল আর ছট্টু আর পালক আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঐ শুনুন খাঁচার শিকে নখে শান দিচ্ছে। তাকাতে ভয় করে। রেল

ভাড়াটা দিয়ে দিন।'

ছোটমামা বলল, 'ছালটা ছাড়িয়ে ফ্যাল, হাত পা বেঁধে দে, ব্যস তোদের ছুটি। এই রকম সাহস নিয়ে তোরা সমাদ্দারের টিকটিকি হতে চাস?'

তখন গুপি বলল, 'ছোটমামা, সব ব্যাপার যদি খুলে না বল তো আমি চললাম। আমার রিটার্ন টিকিট আছে।'

ছোটমামা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলল, 'আগে খাওয়া যাক! তারপর বলব। ও ছুটু, ও পালক, তোমরা তিনপোয়া মাংস নাও, আমাদের একপোয়াতেই হবে।'

গুপি বলল, 'না, মোটেই হবে না। ছোটমামা প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি? 'আর বাড়াস্ নিরে গুপে। সব খুলে বলব, তখন তুই আর তোর মামাকে একা ফেলে পালাতে পারবি নে।'

চৌকিদার বলল, 'একা কেন হবে বড় সাহেব! ওরা তো আছেন।' ছোটমামা তাই শুনে দুহাতে মুখ ঢাকল।

কোন রকমে খাওয়া চুকল, অথচ একশোবার বলতে হবে খাসা রান্না।

মুখ-হাত ধুয়েই ছোটমামা বলল, 'দেখবে চল তবে। পালক আলো নিয়ে আয়।'

চৌকিদার বলল, 'আমি বাসনপত্র মুচ্ছি। আপনারা যান! এই ছুটুটা ভারি ভীতু।'

বড় আস্তাবলের এক কোণে বড় একটা খাঁচা। তাতে ঢাকা লাগানো। লাইটের আলোয় গুপি দেখল, ভিতরে একটা ভালুক। শিক ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চোখে পলক নড়ছে না। ঠোঁটের কোণা দিয়ে নাল গড়াচ্ছে। মনে হল বিড় বিড় করে কি বলছে। গুপি একহাত পিছিয়ে গেল।

নিজে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গুপিকে ঠেলে দিয়ে ছোটমামা বলল, 'ঐ দেখ আগে থাকতেই ভয়ে আধমরা। বলছি ওটা সত্যিকার ভালুক নয়। কুখ্যাত জালিয়াৎ নুটবিহারী, গোয়েন্দার হাত এড়াবার জন্য

ভালুকের ছাল পরে সার্কাসের জানোয়ারদের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কি আর বলব রে, রোজ ঐ ভালুকের খেল দেখতে শহর শুদ্ধ ছেলেবুড়ো ভেঙে পড়ছে। আর কেন নুটুবাবু, এবার খেল শেষ হয়েছে। ভাল মানুষের মতো ছাল ছেড়ে বেরিয়ে এসো। আমাদের সমাদ্দার সাহেব গবরমেণ্টকে বলে-কয়ে তোমাকে মাপ করিয়ে দেবে। ঐ খাঁচায় তো আর জীবন কাটাতে পারবে না।'

ভালুক চুপ করে রইল। শুধু মিটমিটে আলোয় মনে হল চোখ দুটো একবার চকচক করে উঠল।

ছোটমামা গুপিকে আবার ঠেলে দিয়ে বলল, 'যা না, এ তো কিছুই না। ঘাবড়াচ্ছিস কেন? সব ঠিক করে রেখেছি। তুই বললেই এই দড়ি ধরে টানব. খাঁচার দরজা উপরে উঠে যাবে, ব্যস আর কিছু নয়। তুই দৌড়ে গিয়ে একহাতে ওকে জাপ্টে ধরে অন্য হাতে চোয়ালটা ধরে এক টান দিবি অমনি খট্ করে মুণ্ডু খুলে যাবে আর নুটুবিহারী—সপ্রকাশ।'

গুপি বলল—'তুমি গিয়ে জাপ্টে ধর না। আমি চোয়াল টানব।' ছোটমামা বেজায় চটে গেল, 'বলেছি তো. আমার হে-ফিবার আছে, ভালুক দেখলে হেঁচকি আসে,—হিচ্।' গুপি বলল, 'ছটু, ও পালক।' ছটু পালক দরজার বাইরে থেকে বলল, 'সাতদিন ধরে বড় সাহেবের কথায় আমরা চাকর সেজে সার্কাসে নাম লিখিয়ে ভালুকের খাঁচা ধুয়েছি, ভালুকের গোবর সাফ করেছি। কাল রাতে সবাই ঘুমোলে প্রাণ হাতে করে খাঁচা ঠেলে এখানে এনেছি। সত্যি ভালুক না হতে পারে। কিন্তু নুটুবাবুর নখগুলোও তো কিছু কম যায় না।' এই বলে ওদের গায়ে হাতে আঁচড় কামড়ের দাগ দেখাল। নুটুবাবু একটু মুচকি হেসেই আবার গম্ভীর হল।

পালক আরো বলল, 'নিজেরা তফাতে থাকবেন আর আমাদের নুটুবাবুর সামনে ঠেলে দেবেন। ওর ঐ ভালুকছালের পকেটে বোমা নেই বলেছে? নিজেদের যদি একটু সাহস থাকত—'

ছোটমামা বলল, 'না আর অপমান সহ্য হয় না,—গুপে, যা

বলছি। তোকে দূরবীনটা দিয়ে দেব!'

এবার আর বলতে হল না। গুপি এক দৌড়ে খাঁচার কাছে গেল। ছোটমামা দরজা টেনে তুলল আর নুটুবাবু বেরিয়ে গুপিকে জাপটিয়ে ধরে, শূন্যে তুলে সে কি মড়াকান্না জুড়ে দিলে। সকলের গায়ের রক্ত জল! ছোটমামা দু-একবার 'ও কি নুটুবাবু, ওকে ছেড়ে দিন বলছি, ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি?'

নুটুবাবু গুপির কানের কাছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল। আর তাই দেখে চৌকিদার ছটু, পালক সে যে কি হল্লা লাগাল। 'ভালুক ধরল রে, ভালুক খেল রে, ওরে বাবা রে!'

আশেপাশে ধুপধাপ শব্দ! হুড়মুড় করে সার্কাসের লোক এসে উপস্থিত। তারা ভালুকের খোঁজে বেরিয়েছিল, তাদের দেখেই ভালুক গুপিকে ছেড়ে দিয়ে ওদের একজনের গলা জড়িয়ে সে কি হাঁউমাউ। সেও ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আরে চুন্নি রে, তোকে না দেখে আমারো খাওয়া দাওয়া মাথায়—উঠেছিল রে! কিছুই মনে করবেন না স্যার, দশ বছর ধরে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছি ওকে। ও আমার মেয়ের মতো!'

শুনে গুপিও লাফিয়ে উঠল, 'অ্যাঁ। মেয়ে নাকি? তবে যে ছোট-মামা বলল নুটুবিহারী?' সবাই শুনে অবাক! ছোটমামাও আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে—কি—বলে আমার কোন দোষ নেই। সমাদ্দার সাহেবের কাছে বেনামী চিঠি এসেছিল, নুটুবাবু ভালুক সেজে সার্কাসে ঢুকেছে।'

তাই শুনে চৌকিদার কপাল চাপড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরি বাবা, কি তাজ্জবের ব্যাপার। এই তারটা দুপুরে এসেছিল, দিতেই ভুলে গেছি।' সমাদ্দারের তার, 'বেনামা চিঠি হোকস, নুটুবাবু বামাল সমেত ধরা পড়েছে।'

এতক্ষণ পরে ছোটমামার সব ব্যাপারটা মালুম হল। অমনি 'তবে কি ঘরের মধ্যে সত্যি ভালুক ঢুকিয়েছিলাম নাকি রে! ওরে আমাকে ধর!' এই বলে হাত পা এলিয়ে স্রেফ ভির্মি। তারপর দশদিন

বিছানায়। সেই দশদিন গুপির যে কি আনন্দে কেটেছিল। রোজ সকালে সার্কাসের জানোয়ারদের খাওয়া দেখতে যেত, বিকেলে খেলা দেখত। ভালুক সরানোর জন্য মালিক এতটুকু রাগ করেননি। বরং উল্টে বলেছিলেন এরকম দক্ষ টিকটিকির বাড়িতে রোজ মুরগি খেতে পাওয়াও সৌভাগ্য। তাছাড়া যখন ছটু আর পালক, যারা আসল চোর, তারাই ফেরারী, তখন পুলিশ ডাকার কোনো মানেই হয় না। আজও মুরগির দো-পেঁয়াজী হবে নাকি? গুপি ভাবছে দ্বিতীয় টিকটিকি তো বাড়িতে একজন আছেই। আবার তৃতীয় টিকটিকি না হয়ে সার্কাসে ভালুকের খেলা দেখালে কেমন হয়? কিন্তু ছোটমামা নাকি টেলি-স্কোপটা খুঁজে পাচ্ছে না, এই যা দুঃখ।

মস্তান

বুনো হাতি ধরার যত রকম নিয়ম আছে, তার মধ্যে নাকি যে-নিয়মে সেকালে আমাদের বাংলায় হাতি ধরা হত, সেইটেই সব চাইতে ভালো।

আজ অবধি ঐ নিয়মেই বেশির ভাগ হাতি ধরা হয়। সেই সব পুরনো নিয়ম হস্ত্যায়ুর্বেদ বলে পুরনো পুঁথিতে লেখা আছে।

তবে হাতি-ধরার সে দিন আর নেই।

সেকালে বড় লোকেরা হাতি পুষতেন, রাজা-রাজড়ারা হাতি চেপে বাঘ-শিকারে যেতেন। তা ছাড়া সাধারণ লোকেরাও হাতি পেলে বেঁচে যেত; পথ-ঘাটে কাদা, রেল নেই, জীপ নেই, ট্রাক নেই। কাজেই হাতি-ধরার ব্যবসাও চলত ভালো।

এখন শখ করে ছাড়া কেউ হাতি চাপে না, হাতির কাজ জীপ দিয়ে চালানো হয়, তাই হাতির দরকার কমে গেছে।

আর দুঃখের বিষয় হাতির দাঁতের লোভে লোকে এত বেশি হাতি মারত যে হাতির সংখ্যা বড়ই কমে গেছিল।

আজকাল যাকে-তাকে হাতি ধরতে দেওয়া হয় না। খ্যাপা হাতি লোকের ক্ষতি করছে দেখতে না পেলে, কাউকে হাতি মারতেও দেওয়া হয় না। তাতে হাতির সংখ্যা নাকি কিছু বেড়েছে, বিশেষ করে তাদের জন্য অভয়ারণ্য তৈরি করার পর।

সে যাই হক, এই হাতি ধরার ব্যাপারটি বড় চমৎকার।

বুনো হাতি ধরা খুব সহজ নয়, ওস্তাদ লোক না হলে কেউ পারেও না। একে হাতির গায়ে ভয়ঙ্কর জোর, বুদ্ধিও প্রখর, তার ওপর ওরা দল বেঁধে ঘোরে, একজন করে পালের গোদা থাকে, সে বুদ্ধিতে আর বলে দলের সবার ওপরে।

দলের সব হাতিরা তাকে মেনে চলে। মেয়ে হাতিরা আর বাচ্চারা তো চলেই, খুব বুড়ো আর জোয়ান হাতিরাও তাকে মানে।

যে মানে না, তাকে হয় পালের গোদাকে যুদ্ধে হারিয়ে নিজে পালের গোদা হতে হয়, নয় তো দল ছেড়ে চলে গিয়ে, নিজের অন্য দল পাকাতে হয়।

পালের গোদা হওয়া খুব সহজ কথা নয়, ;তাকে হতে হয় নেতা রাজা, পাণ্ডা, সরদার যাই বল।

চরে বেড়াবার ভালো জায়গা তাকেই খুজে বের করতে হয়।

বাঘ ভালুক, অন্য হাতির দলের কাছ থেকে কিংবা মানুষের হাত থেকে নিজের দলকে সে-ই রক্ষা করে।

তাকে যেমন সকলে মেনে চলে, সে-ও-তেমনি তাদের জন্য সর্বদা প্রাণ দিতে তৈরি।

এই রকম একটা হাতির নাম গ্রামের লোকেরা দিয়েছিল মস্তান। মস্তান মানেই সরদার, সাধারণতঃ গুণ্ডাজাতের লোকেদের বলে সরদার। মস্তানের দলের জোয়ানদের-ও যেমনি গায়ের জোর ছিল, তেমনি সাহস-ও ছিল। সরদারকে ছাড়া কাউকে তারা জানত না।

মস্তানের দলকে গ্রামের লোকেরা চিনলেও, হাতিরা তাদের

এড়িয়েই চলত।

হাতিরা থাকত ঘন বনে, যেখানে মানুষের বাস ছিল না। মস্তান তাদের সব রকম বিপদ থেকে চিরকাল রক্ষা করে এসেছিল, অন্য হাতির দল বড় একটা কাছে ঘেঁষত না।

নিরাপদেই ছিল ওরা, দল বেড়ে বেড়ে দেড়শো দুশোতে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ডাকে পাহাড় কাঁপত, গ্রামের লোকেরা বলত 'ঐ যে মস্তানের দল!' তারা চেনা হাতির দলের খোঁজ-খবর রাখত।

বিপদ যখন এল, সে দলের ভিতর থেকেই এল। এমন কি মস্তানের নিজের ছেলের কাছ থেকেই এল। মেঘের মতো কালো, প্রায় মস্তানের মতই বড় সেই হাতি। তাকে লোকে বলত ঝড়।

মস্তান যত বুড়ো হতে লাগল, ঝড়ের বল ততই বাড়তে থাকল।

শেষে এমন হল যে দলের মধ্যে দুটো দল দেখা দিল।

জোয়ানদের দল ঝড়ের চারদিকে জড়ো হল। এর আগে কখনো এমন হয়নি।

মস্তান যখন নতুন বনের সংকেত দিল, ঝড়া অন্য দিকে মুখ ফেরাল। তার সঙ্গে সঙ্গে এক দল কম-বয়সী হাতিও মুখ ফেরাল।

সারি বেঁধে তারা অন্য দিকে রওনা দিল।

মস্তানের তখন বয়স হয়েছে, কিন্তু পর্বতের মতো চেহারা, বজ্রের মতো গায়ের জোর। উঁচু একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সে যুদ্ধে ডাকদিল।

এমন ডাক তার দলের কেউ কখনো শোনেনি। দূরে গ্রামের লোকেরাও সেই ডাক শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

মনে হল বাতাস বওয়া বন্ধ হল, চারিদিক থম-থম করতে লাগল। মেয়ে হাতিরা কিছু দূর সরে গিয়ে, মাঝখানে বাচ্চাদের রেখে, বাইরের দিকে মুখ করে, গোল হয়ে দাঁড়াল।

মস্তানের দলের পুরুষ হাতিরা কাঠ হয়ে তার পিছনে দাঁড়াল।

সে ডাক ঝড়ের কানেও গেছিল। তার দলের পুরুষরা থমকে দাঁড়াল। চিরকাল তারা মস্তানকে মেনে এসেছে হঠাৎ তারা দো-মনা

করতে লাগল, যাবে, নাকি থাকবে !

ডাক শুনে ঝড়-ও ফিরল ; সে-ও বুঝল এইবার এইখানে একটা বোঝা-পড়া হবে।

সব হাতিরা সরে গিয়ে যুদ্ধের জন্য জায়গা করে দিল।

মস্তান আর ঝড় দুজনে এগিয়ে এল।

কয়েকজন বেজায় সাহসী কাঠুরে সেই যুদ্ধ দেখেছিল। তারা-ই পরে গাঁয়ে গিয়ে খবর দিয়েছিল।

সে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বর্ণনা দেবার তাদের সাধ্য ছিল না।

অনেকক্ষণ ধরে নাকি যুদ্ধ হয়েছিল। যোদ্ধারা ছিল প্রায় সমান সমান! কি তাদের দাপট, কি তাদের গর্জন! বাকিরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

সেই যুদ্ধে দুজনার একটি করে দাঁত ভেঙেছিল, সারা গা রাক্তাক্ত হয়েছিল। তবু তারা থামেনি।

শেষটা হঠাৎ যুদ্ধ থেমে গেছিল।

কেমন করে না জানি বুড়ো মস্তান হাঁটু গেড়ে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। আর কিছুতেই উঠতে পারল না।

শত্রুকে বে-কায়দায় পেয়ে ঝড় তেড়ে এসেছিল। কাঠুরেরা শিউরে উঠেছিল, এইবার বুঝি মস্তানের শেষ সময় এল।

কিন্তু গর্তের কিনারায় এসে ঝড় থেমে গেল। তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে নিজের পথ ধরল।

যে-বনে সে যেতে চেয়েছিল, সেই বনে চলে গেল ঝড়। সঙ্গে গেল সারি সারি হাতি।

কয়েকটা বুড়ি হাতি আর তাদের বাচ্চারা কিন্তু গেল না। তারা ছায়ার মত সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

মস্তান চুপ করে পড়ে রইল।

আরো রাত হলে কাঠুরেরা ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে নেমে গাঁয়ে ফিরে গেল।

তিন-চার দিন বাদে সেই জায়গায় গিয়ে তারা কোনো হাতির

দেখা পেল না।

এর পরের বছর ঝড়ের দল খেদায় ধরা পড়েছিল।

হাতি ধরার ক্যাম্পকে খেদা বলা হয়। বাংলার পুরনো নিয়মের খেদার লোকেরা ঐ সব হাতি ধরেছিল।

পরে তারা একটা অদ্ভুত কথা বলত। খেদায় ঘেরা হাতিগুলো যখন খুব দাপাদাপি করছিল, তখন বনের মধ্যে নাকি আরো কয়েকটা বুনো হাতি ব্যাকুল হয়ে ঘোরাঘুরি করছিল।

তাই শুনে গাঁয়ের লোকেরা বলাবলি করত ওরা যে মস্তান আর তার বুড়ি হাতিরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের হাতিদের রক্ষা করতে না পেরে মস্তানের নিশ্চয় বড্ড কষ্ট হচ্ছিল।

———

আষাঢ়ে গল্প

আষাঢ় মাসের প্রথম দিন শুরু হল গল্প। বর্ষা এই এল বলে গরম তো নয় অল্প। গাঁ সুদ্ধ সকলের মেজাজ বিগড়ে আছে, কথায় কথায় রাগ।

সন্ধ্যেবেলায় বড়ডাঙার মাঠে, কাঁচা এক বেল ঠেঙিয়ে ফুটবল খেলার পরে, বগাই, দামু, টপ্পা, ভোঁদা, মাইকেল, নেপু, নাহু, করকরি, কেষ্টা, জনি, আলি ইত্যাদি দশ-বারোজন ঝগড়া করছিল। এমন সময় গয়লানী মাসি এসে কেঁদে পড়ল,

"ওরে বগা দামু টপ্পা ভোঁদা বল্ দিকিনি
কেলে ধলা পাট্‌কিলে সোনা পুষি মিনি,
ছ-জনার একটিকেও দেখতে কেন পাচ্ছিনি?
খাবি দাবি ল্যাজ নাচাবি কাজের বেলা কাঁচকলা,
এই কথাটা নরম করে একবারটি যেমনি বলা—

শুনেই সবাই খাট থেকে, মোড়া থেকে সাফ কাপড়ের ঝোড়া থেকে, খেয়েদেয়ে যে যেখানে শুয়েছিল, অমনি হঠাৎ সেখান থেকে সটাং দিল, অমনি লক্ষ্মীছাড়া! আমি হেথা উপবাসী, হেঁপো কাশি, সারাদিন বিরাম-বিহীন খুঁজে খুঁজে সারা! একবারটি যা দিকিনি, খুঁজে-পেতে ধরে নিয়ে আয়, নইলে আমার পেরাণ যায়। লেবু চিনি মাঠা দিয়ে দেব খেতে মস্তপানা ঘটি ভরে, মানিক ওরে, সন্ধ্যেবেলায়, যে জায়গাতে যেতে নেই, ভালো করে সে-সব জায়গা আয় তো দেখে, বাবাজীবন! সোনামানিক, চোখের মণি, বুকের ধন!

বেড়াল ছেড়ে কেমন করে বেঁচে থাকি বল্ এখন!"

মাসি থেমে হাঁপাতে লাগল। তারপর আবার বলল, "বল্ আমারে, বেড়াল ছেড়ে, দুঃখী কভু থাকতে পারে?"

ব্যস্, ওদের ঝগড়া থেমে গেল, যেন আগুনে কে জল ঢালল। নেপো বলল, "দেবে তো ঠিক বল মাসি কিন্তু তুমি দুঃখী শুনে পাচ্ছে হাসি। আমরা আছি বারোজনা তায় নাদু একটু বেশি করেই খায়। মাসি জিব্ কেটে বলল,

"দোব, দোব, দোব! এবার ওঠ্ দিকিনি, খুঁজতে বেরো।
সন্ধ্যে লাগলেই খায় যে ওরা, বল তো বাবা, এ কি গেরো।
মাঠা তো দেবই তোদের, আখের গুড় দিয়ে ছানা মেখে দেব,
বাছারা আমার ছানা মুখে দেয় না।"

আর দেখতে হল না। যে যেখান থেকে পারল লাঠি-সোঁটা, গোটা গোটা গাছের ডাল চেঁচেছুলে, কাঁধে তুলে রওনা দিল। তাই দেখে মাসির এদিকে চক্ষু স্থির! ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল,

"মারিস্‌নে বাপ, লাগবে ওদের। বলছি তোদের, বড্ড নরম গা। কাজ করে তো অভ্যেস নেই, আদুরে শরীর। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাড়িয়ে আনিস্। যাই তোদের মাঠায় লেবু গুলি গিয়ে।"

আর কি ওরা থাকে সে বাটে। সোজা গেল মাছ-ধরুনির ঘাটে। যেখানে জেলেরা ডিঙি উপুড় করে, সেখানকার মাটি শ্যাল কুকুরে চাটে। সেইখানেই মাসির বেড়াল পাওয়া যাবে। রোজ রোজ ক্ষীর মাখন দুধ সর খেয়ে খেয়ে সব এমনি ফুলেছে যে কেউ গাছে চড়তে পারে না। তাই বেল-তলায় কি শ্যাওড়া-বনে খুঁজে লাভ নেই! দূরও অনেক!

যা ভেবেছিল ঠিক তাই! ঘাটের কিনারায় ক'টি আঁশ পড়ে ছিল। সাদা, কালো, ছাই, হলুদ, ছোপ-ধরা আর ডোরা-কাটা ছটি মোটা মোটা বেড়াল তাই শুঁকে হন্যে হচ্ছিল। সূর্য ডোবার সঙ্গে তাদের পাথর-বাটিতে ক্ষীর মোয়া খেয়ে অভ্যেস।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম উপর নিচ এ-পাশ ও-পাশ, এই বারো দিক থেকে লাঠি-সোঁটা নিয়ে যখন বারোজন রে-রে-রে-রে করে ছুটে এল, তখন তারা পালাবার পথ পায় না। খালি এক জায়গায় ইচ্ছে করে একটু ফাঁক রাখা হয়েছিল: বুদ্ধি তো নয় কম। নেপুর আর নাদুর মধ্যিখানের সেই ফাঁকটি দিয়ে সাঁই-সাঁই করে ছয় বিল্লি হাওয়া!

মিয়াও-মিয়াও করে দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে তারা একেবারে গাঁয়ের মধ্যিখানে পৌঁছে গেল। আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ-ঝাড়, নালা-নর্দমা, খানা-খন্দ, আস্তাকুঁড় আর ছাই-গাদা থেকে, দলে দলে পাঁশ-কুড়ুনি, উনুনমুখো, হাঁড়ি-খেকোরা যে যেখানে ছিল, নিজেদের মধ্যেকার বারোমেসে ঝগড়াঝাটি ভুলে,
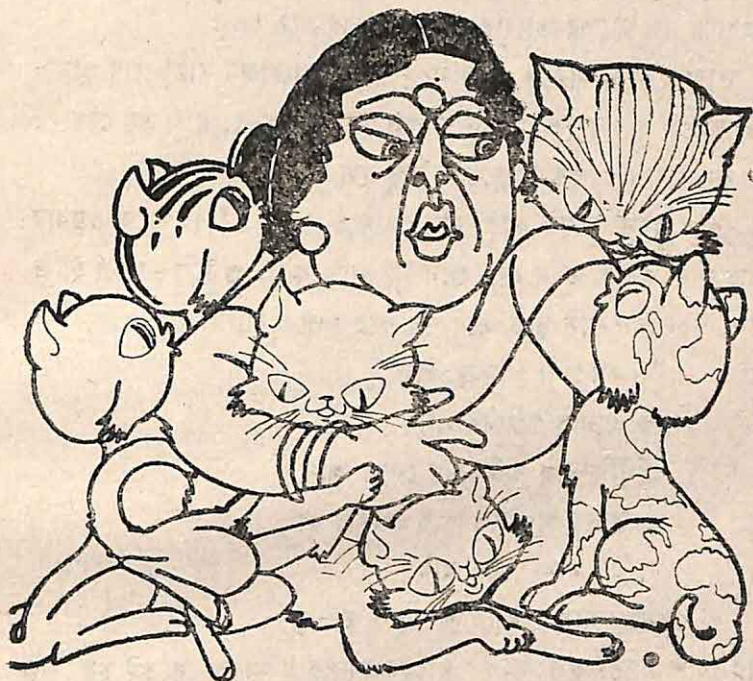
সরু-মোটা, লম্বা-বেঁড়ে, ঝাঁকড়া-ন্যাড়া ল্যাজ না তুলে,
নানান্ সুরে নানান্ স্বরে গলা ছেড়ে,
হৈ হৈ হুদ্দাড় হাঁচড়-পাঁচড় এল তেড়ে।
এক দিকে—"খেউ খেউ খেউ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্
ও দাদা! এবার মজা গ্যাখ্ গ্যাখ্ গ্যাখ্!"
আর অন্য দিকে—"মিঁ-য়া-ও ফ্যাঁশ—ফোঁশ!
এলাম বলে। একটু বোস্!
খচর-খাচর, মারব আঁচড়,
ফেলব ছিঁড়ে আমি আগে!
—ই-কি দাদা, কোথায় ভাগে?"

তখন গয়লানী-মাসির ছয়টা আহ্লাদে বেড়াল, যারা কাজকম্ম করে না, শুধু খায় আর ঘুমোয়, আলো পড়লেই যাদের চোখের কপাট বন্ধ হয়, নখ যাদের লুকিয়ে থাকে আর মোটা শরীর নিয়ে যারা গাছে চড়তে পারে না, প্রাণের ভয়ে সেই ছয়টা আদুরে বেড়াল, বিদ্যুতের হল্‌কার মতো শ্‌-শ্‌-শ্‌ঁ্যা-ৎ করে গাঁয়ের মোড়লের ন্যাড়া চাঁচাছোলা তালগাছের একেবারে মগ্‌ডালের তালের গোছার ওপর উঠে বসল।

তারপর আর নামতে পারে না! এরা বারোজন মাঠা আর ছানা-মাখা ফস্‌কে যাবার ভয়ে, কত ডাকল, কত বোঝাল, কত ভয় দেখাল, কত ফুস্‌লাল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

শেষে যখন বগাই আর দামু কোমরে কাছি বেঁধে গাছে চড়বার তোড়জোড় করছে, তখন হল্লা শুনে উঠি-পড়ি করে, শুটকি-মাছের হাঁড়ি হাতে, গয়লানী-মাসি ছুটে এসে সুর করে বলতে লাগল,

"ও আবাগী! মচ্ছি খাগী!
কি এনেছি তোদের লাগি!
শুঁটকি-মাছ খাবি যদি নেমে আয়!
এ সুগন্ধে আকাশে-পথে সোনার রথে
সূয্যি- মামা থেমে যায়!
নেমে আয়! আ—তু—তু—তু—তু"

আর বেশি বলতে হল না। মাছের খোসবাই নাকে যেতেই ছয় বিল্লি ভয় ভুলে সর-সর করে নেমে এসে, একসঙ্গে গয়লানী-মাসির কোলে উঠবার জন্য হাঁকুপাঁকু করতে লাগল। মাসির একটু রাগ-ও হয়েছিল। ইদিকে কাজকম্মের নাম নেই, তা কিছু বলেছে কি না বলেছে, অমনি পিট্টান! ভোঁদা দেখল মাঠার আর ছানা-মাখার তাহলে বোধ হয় হয়ে গেল! সে মাসিকে বলল, "রাগ কিসের, মাসি? কাজ তো করে ওরা। ওরাই না ইদুর ভাগায়!—বলি মাঠা, ছানা পাব তো?"

মাসি এক গাল হেসে বলল, "পাবি, পাবি, সব ঠিক করে রেখে এসেছি। আয়, সোনামুখোরা, সবাই একসঙ্গে আমার কোলে আয়!"

তখন ছয়টা বেড়াল ছয় লাফে মাসির কোলে মাথায় ঘাড়ে চেপে—

পুরনো সেই মাছগন্ধী আরামপন্থী নিরাপত্তার আশায়, যা বলল সবাই খটমট দুর্বোধ্য এক বেড়ালীর ভাষায়,—তার সোজা বাংলা করলে দাঁড়ায়—

মিয়াও—ম্যাও—মুম্ !

তোমার খাটের মধ্যিখানের যে জায়গাটা সবার থেকে নরম,
তোমার গায়ের ছোঁয়াচ লেগে চ্যাপ্টা এবং গরম—
ভালোবাসার চোটে মোদের নেই কো লজ্জা শরম ! মুম !
সেইখানেতে দেব মোরা নিরাপদে ঘুম !
বিদ্‌ঘুটে কুত্তো এলে বল দূর দূর !
তবু যদি না যায় তবে মারিও লগুড় !
আমরা ছ-জনা তোমারি ক-জনা,
অন্যায় যদি করে থাকি অ মা,
শুঁট্‌কি মাছে ভাত মেখে করিও ক্ষমা !
মুম্ । দাও চুম্ !

———

তানির ডাইরি

এই যে বড় বনটা দেখছ, এতে হাজার হাজার গাছ আছে। শাল, সেগুন, আম, কাঁঠাল। কি ভালো ভালো সব গাছ। তার কাঠ দিয়ে কত কি জিনিস তৈরি হয়। জাহাজে করে বিলেতে যায়-এসব কাঠ, তা জান ? যে-সে গাছ কাটতে পারে না, দপ্তরখানা থেকে টাকা জমা দিয়ে শীল-মোহর করা চিঠি আনতে হয়। জান, আগে আমার বাবা এই বনের চৌকিদার ছিল ; চক্‌চকে পেতলের তক্‌মা আছে বাবার। বাবার নাম ফাগুলাল। দপ্তরের ছোট সায়েব যেই ডাকত ফেগো-ও-ও ! বাবা ছুটতে ছুটতে যেত। বাবা না গেলে কোনো কাজ-ই হত না। এখনো হয় না। ভয়ঙ্কর ভালো আমার বাবা।

এই বনটার নাম ভীম্‌নি। সেকালে এই বনে বাঘ থিক-থিক করত। একা কেউ বেরোত না। সন্ধ্যের আগে সবাই বাড়ি ফিরে ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকত। আমার প্রাণের বন্ধু শিবুর দাদু বলে, বাঘরা সব নাকি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াত। মানুষের মতো গলা করে একবার দাদুকে রাত দুপুরে ডেকেছিল—“ও ছোক্‌না বাড়ি আছ ? আতান্তরে পড়েছি। দোর খোল।” দাদু হয়তো খুলেই দিত, বিপদে পড়ে কেউ এলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হয় না। তা বুড়ি-দিদি—সে হল দাদুর মা—সে দাদুকে কোলপাঁজা করে ধরে রাখল, কিছুতেই দরজা খুলতে দিল না। বাতার ফাঁক দিয়ে দাদু দেখেছিল ঐ গাছতলা দিয়ে চাঁদের আলোয় এই বড় বাঘ দাপিয়ে দাপিয়ে চলে যাচ্ছে ! শিবু বলে দাদু বানিয়ে গল্প বলে।

এখন ভীম্‌নির বনে একটাও বাঘ নেই। শিকারীরা মেরে মেরে শেষ করেছে। অথচ এটা বাঘ থাকার জায়গা ; এই রকম জল হাওয়া মাটিতে বাঘরা ভালো থাকে। তাই এখানে বাঘের চাষ হবে। একজন

লাল-মুখো সায়েব আর একজন বাঘ-বাবু এসে সব দেখেশুনে গেছে। বনের চারদিকে ঘেরাও দেওয়া হবে। যাতে বাঘরা পালাতে না পারে আর দুষ্টু লোকরা আবার বাঘ মেরে শেষ করতে না পারে। জান, আমার বাবা বাঘ-জেমাদার হবে, বাঘ যাতে গুন্তিতে কম না হয়, তাই দেখবে।

আমার মার কি ভয়! "হ্যাঁ গো, বাঘ যে গুনবে, বাঘ যদি কামড়ে দেয়?" মেয়েরা বড় ভীতু হয়। বাবার একটুও ভয় নেই। বাবা বলল, "এই যে বন দেখছ, এতে এত গাছ কি করে হল জান? একটা গাছ কাটার এক বছর আগে ঠিক ঐ জাতের তিনটে গাছ পুঁতে দিতে হয়। দুটো হয়তো মরে যায়, একটা বাঁচে। বড় গাছটা কেটে ফেললে, সেই গাছ তার জায়গা নেয়। তোমারো দুটো ছেলে আছে। তানিটা বড় কিন্তু ন্যাংড়া, তাকে দিয়ে কিছু হবে না। কিন্তু পুন্নুর কি তাগৎ দেখেছ? পুন্নু আমার জায়গা নেবে"—

আর শুনিনি আমি। ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে গভীর বনে চলে গেছিলাম। আমার নাম তানি। আমার ডান পায়ের সব আঙুল তলার দিকে দুমড়ানো। আমি গোড়ালিতে ভর দিয়ে হাঁটি। সবাই আমাকে বলে ন্যাংড়া। পুন্নুও আমাকে ন্যাংড়া বলে, দাদা বলে না।

আমি পাঠশালে যাই না। দু' বছর আগে বাবা আমাকে নতুন সাদা পাজামা আর লাল ফতুয়া পরিয়ে ডাকঘরের পাশের পাঠশালে ভরতি করে দিয়েছিল। কাঠের সিলেট আর এক বাক্স চক্ কিনে দিয়েছিল। খড়িকে এরা বলে চক্। তা যেই আমি টিপিনের ছুটিতে বেরিয়ে এসেছি, অমনি সব ছেলেমেয়েগুলো আমাকে ঘিরে সুর করে বলতে লাগল, খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং! কার বাড়িতে গিয়েছিলি, কে ভেঙেছে ঠ্যাং!

সেই যে এক দৌড়ে পালিয়ে এলাম আর যাইনি। বাবা মারলেও যাইনি। মা আমার নতুন পাজামা ফতুয়া বাক্সে বন্ধ করে রাখল। সেগুলো পরে সিলেটটা নিয়ে এ-বছর পুন্নু পাঠশালে যায়। আমি

ওতে ছবি আঁকতাম।

কি আঁকতাম জান? পাখি উড়ছে, ঘোড়া ছুটছে, হরিণ লাফাচ্ছে, মাছ সাঁতার দিচ্ছে, ভালুক পালাচ্ছে, শিকারী তীর ছুঁড়ছে।—আমি এ-সব কিচ্ছু পারি না। আমি দৌড়তেও পারি না। তাই ওরা আমাকে খেলায় নেয় না। আমাদের ডেরায় কত খেলা হয়; ফুটবল, দৌড়-ঝাঁপ, গোল্লা-ছুট, খো-খো—আমি খালি খুব ভালো মার্বেল খেলতে পারি। আমার দিদা আমাকে ঠাট্টা করে বলে, "তানির আবার ভাবনা কিসের? কি ভালো কাঁথা-সেলাই করে, তক্‌লিতে সুতো কাটে, রান্না করে!" আমার গলা ব্যথা করে, আমি বনের মধ্যে পালিয়ে যাই।

ভীম্‌নির বনের মধ্যে আছে তরাই নদী। তার দু'ধারে দু'কালি বালি, তারপর টিলার গায়ে নোনা-পাথর। জানোয়াররা সেখানে জল খেতে আসে। জল খাওয়া হলে নোনা-পাথরে চাটন দিয়ে বনে ফিরে যায়। নূন ছাড়া ওরা বাঁচে না। হরিণ আসে, শেয়াল আসে, বন-বেড়াল আসে, ভালুক আসে। সকালে তাদের পায়ের ছাপ দেখা যায়।

শিবুর দাদু বলে, "নোনা-পাথরের জন্যেই এখানে বাঘের চাষ হচ্ছে। তোর বাবার মাইনে বাড়ল।"

বাবার মাইনে বাড়লেই পুনুর জন্যে জুতো কেনা হয়। আমার পা জুতোয় ঢোকে না। ওরা ঠাট্টা করে আমাকে ফুটবল খেলতে ডেকেছিল। মাকুদা ওদের কাপ্তান, তার মস্ত বুট আছে। সে আমাকে বলল, "তোকে জুতো কিনে দেয়নি তো কি হয়েছে, এই নে এই বুট্ পরে তুই-ও খেলতে পারবি।" যাইনি, বনে পালিয়েছিলাম।

বনে একটা সুন্দর জায়গা আছে। মধ্যিখানটা একটা গোল গভীর পুকুরের মতো, তার ধারে বালি, তার ধারে কালো পাথরের চাঁই, চারদিকে বড় বড় বাঁশ-গাছ। কালো পাথরের ওপর ছুঁচলো চক্‌মকি দিয়ে আমি ছবি এঁকেছি, চিল ছোঁ মারছে, হাতির পাল শুঁড় তুলে

দৌড়চ্ছে, এই সব। যা আমি পারি না, সব আমার আঁকার জানোয়াররা পারে। পাহাড়ি ছাগল পাথর বেয়ে ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে যাচ্ছে—আ কি।

সেদিন দেখি আমার আঁকার জায়গায় মস্ত এক কালো বন বেড়াল শুয়ে শুয়ে পাঁচটা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। আরেকটা বাচ্চা রোগা, রোঁয়া—ওঠা, তাকে সবাই ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। সবুজ চোখ দিয়ে মা তাই দেখছে, কিচ্ছু বলছে না। আমার বুকটা খুব জোরে টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। বিচ্ছিরি দেখতে ছানাটা ঠিক তাদের নিচেই নদীর

সেই গোল গভীর জায়গাটা। সেখানে মাছ লাফায়। তারি জলে মা বেড়াল আর ছানা বেড়ালদের ছায়া পড়েছিল। রোগা ছানা বারবার মিউ মিউ করে ঠেলে-ঠুলে মা-র বুকের কাছে যেতে চেষ্টা করছিল আর বারবার ভাইরা তাকে ঠেলে দিচ্ছিল।

রেগে ছানাটা ফ্যাশ করে যেই না লাফ দিয়েছে, অমনি পাথরের

কিনারা থেকে খসে টুপ্ করে জলে পড়েছে। আমি আজকাল সাঁতরাতে পারি। এইখানে এসে মাঝে মাঝে সাঁতরাই। কেউ জানে না।

জলে নেমে ছানা তুলে, আমার ফতুয়ার বুকে পুরে নিয়ে চলে এলাম। ধারালো নখ দিয়ে সে আমাকে আঁকড়ে ধরল। ওকে পলতে করে দুধ খাওয়াব। পুষব। জান, ও-ও একটু খুড়োয়।

রাতে সেই লাল-মুখো সায়েব আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে ডেকে কি বলল। আমার ওপর বাবার কি রাগ! "কালো চিতার ছানা নিয়েছিস্? মাচা থেকে সায়েব দেখেছে। রেখেছিস্ কোথায়? ফতুয়ার ভেতর থেকে বের করে দিলাম।

সায়েবের সঙ্গে সেই কালো মুনসী-বাবু ছিলেন। তিনি বললেন, "তোর সাহস দেখে সায়েব থ'! চিতার মুখ থেকে ছানা তুলে আনলি!"

আমি বললাম, "চিতা না, কালো বেড়াল। মস্ত বড়। ওকে কেউ চায় না।"

মুন্সী বললেন, "সাহেব বলছেন তুমি ওকে চাও? তাহলে পুষতে পার। কে ওর যত্ন করবে?"

আমি ভূষোকে আবার ফতুয়ায় গুজে রাখলাম। ওর নাম রেখেছি ভূষো।

সাহেব হঠাৎ আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আমার ডান পা-টা দেখল। তারপর আমার মাথা চাপড়ে দিয়ে গেল। রাতে বাবা বলল, "সদর হাসপাতালে গিয়ে তোর পা ঠিক করিয়ে আনব। মুন্সী-বাবু সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন।—এই! এই! বনে পালিও না, কালো চিতা ছানা আছে। বনের ওদিকটা ঘিরে দিলে, জানোয়াররা এদিকে আসতে পারবে না!"

তার পর এক বছর কেটে গেছে। আমি আজকাল দৌড়াই। ভূষো দৌড়য়। শিবুর দাদুর কাছে আমার লিখতে পড়তে শেখা হয়ে গেছে। সবাই অবাক। আমি স্কুলে যাই। বলিনি এ-বনটা বড় ভালো।

সেজমামার চন্দ্রযাত্রা

আমার ছোটকাকা মাঝে মাঝে আমাদের বলেন, 'এই যে তোরা আজকাল চাঁদে যাওয়া নিয়ে তো এতো নাচানাচি করিস, সে কথা শুনলে আমার হাসি পায়। কই, এত খরচাপাতি, খবরের কাগজে লেখালেখি করেও তো শুনলাম না কেউ চাঁদে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে! তোরা আবার এটাকে বৈজ্ঞানিক যুগ বলিস, ছোঃ।'

আমরা তখন বলি, 'তার মানে? কী বলতে চাও, খুলে বলো না।'

ছোটকাকা বলেন, 'তার মানেটা খুবই সোজা। চাঁদে যাওয়াটা কিছু একটা তেমন আজকালকার ব্যাপার নয়। পঞ্চাশ বছর আগে আমি নিজেই তো একরকম বলতে গেলে চাঁদে ঘুরে এসেছি।'

আমরা তো অবাক!—'একরকম বলতে গেলে কী? গেছিলে, না যাও নি?'

ছোটকাকা বইয়ের পাতার কোণা মুড়ে রেখে পা গুটিয়ে বসে বললেন, 'তাহলে দেখছি সব কথাই খুলে বলতে হয়। বয়স আমার তখন বারো-তেরো হবে, পূজোর ছুটিতে গেলাম মামার বাড়িতে। সেজমামা অনেক করে লিখেছেন। এমনিতেই আমি কোথাও গেলে সেখানকার লোকেরা খুব যে খুসি হয় বলে মনে হয় না আর সেজ-মামা তো নয়ই। তাছাড়া দিদিমা সারাক্ষণই এটা-ওটা দেন, খাওয়া-দাওয়া ভালো, পুকুরে ছিপ ফেললেই এই মোটা মোটা মাছ, গাছে চড়লেই ডাঁসা পেয়ারা। না যাবার কোনো কারণই ছিলো না।'

সেখানে পৌঁছে দেখি, সেজমামা কোত্থেকে একটা লড়বড়ে মোটর গাড়ি যোগাড় করে আমাকে নিতে স্টেশনে এসেছেন। আমাকে দেখেই, মাথা থেকে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আগের চেয়ে যেন একটু ভারি-ভারি লাগছে। হ্যাঁরে তোর ওজন কতো রে?'

কিছুদিন আগেই স্কুলে সবাইকে ওজন করেছে। বললাম,

'আটত্রিশ সেরের সামান্য বেশি।'

সেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার বেশি কেন ? সে যাকগে, ওতেই হবে, এখন গাড়িতে ওঠ্, চল্ তোকে একজায়গায় নিয়ে যাই, খুব ভালো খাওয়ায় তারা।'

সেজমামাকে গাড়ি চালাতে দেখে আমিতো অবাক, 'তুমি আবার গাড়ি চালাতে পারো নাকি ?'

সেজমামা বেজায় রেগে গেলেন, 'কী যে বলিস। আরে এই সামান্য একটা গাড়িও চালাতে পারবো না ? বলে কি না যে আমি —যাক্গে, চল্ তো এখন।'

সোজা নিয়ে গেলেন কুণাল মিত্তিরের রহস্যময় বাড়িতে। ও বাড়ির ভেতরে এখানকার কেউ কখনো যায়নি, কুণাল মিত্তিরের নাম সবাই জানে, তবে তাকে কেউ কখনো চোখে দেখেনি। একটা উঁচু টিলার ওপরে অদ্ভুত বাড়ি, বাড়ির চারিদিকে দেড়-মানুষ-উঁচু পাঁচিল, তার ওপরে কাঁটাতারের বেড়া, দেয়াল কেটে লোহার গেট বসানো, সেটা সর্বদাই বন্ধ থাকে। শোনা যায়, কুণাল মিত্তির নাকি নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, সে-সব সাধারণের জন্য নয়, অতি গোপন ও গুহ্যভাবে করতে হয়।

প্রকাণ্ড টিলাটার গা বেয়ে যদি চড়া যায়, ওপরটা চ্যাপ্টা, সবটা ঘিরে পাঁচিল, আশেপাশে কোনো গাছগাছড়াও নেই যে তাতে চড়ে পাঁচিলের ভিতরে দেখা যাবে কিছু। তার ওপর মাঝে মাঝে ভেতর থেকে বাড়ি কাঁপানো গর্জন শোনা যায়, লোকে বলে নাকি দুজোড়া ডালকুত্তা দিনরাত ছাড়া থাকে। মোট কথা, কেউ ওদিকে বড়ো একটা যায় না। চারিদিকে দু-তিন মাইলের মধ্যে কারো বসতিও নেই। ফাঁকা মাঠ, আগাছায় ভরা।

সেইখানে তো গেলেন আমাকে নিয়ে সেজমামা। আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাঁ গাঁ করতে করতে গাড়িটা তো টিলার ওপরে চড়লো! তারপর প্যাঁক-প্যাঁক করে হর্ন বাজাতেই লোহার দরজা গেলো খুলে। আমরাও ভেতরে গেলাম। অবাক হয়ে দেখি চমৎকার ফলবাগান,

একতলা লম্বা একটি বাড়ি তার বারান্দায় একটা বড়ো কালো বেড়াল সোজা হয়ে বসে সবুজ চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে ! একটা উঁচু দাঁড়ে নীল কাকাতুয়াও একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমাদের বলছি কেন, আসলে আমাকে দেখছে।

অমনি চারিদিক থেকে দলে দলে চাকরবাকর ছুটে এসে মহা খাতির করে আমাদের নামালো। বারান্দা থেকে একজন ভদ্রলোকও এগিয়ে এলেন, ফর্সা, কোঁকড়া চুল, বেঁটে মোটা, বয়স বেশি নয়। সেজমামাকে ফিসফিস করে বললাম, 'ঐ নাকি সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কুণাল মিত্তির, যাকে কেউ চোখে দেখেনি ?'

শুনতে পেয়ে ভদ্রলোক চটে গেলেন, 'কেউ চোখে দেখেনি কী, আমি বিলক্ষণ দেখেছি। বিশ্রী দেখতে।'

সেজমামা বললেন, 'আহা, বড়ো কথা বলিস। ঐ তোর দোষ। কিছু মনে করো না, মনোহর—উনি কুণাল মিত্তির হতে যাবেন কেন, কুণাল মিত্তির ওঁর বাবা, ওঁর নাম মনোহর মিত্তির, আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। একদিন উনি ওঁর বাবার চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবেন। জানিস তো, মিত্তিররা কী রকম চালাক হয়।'

মনোহরবাবু তাই শুনে ছোটো গোঁফটাকে একটু নেড়ে বললেন, 'আর তুমিও তারচেয়ে খুব বেশি কম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবে না। —কী যেন নাম তোমার বললে ?'

বললাম, 'আগে বলিনি, এখন বলছি—ইন্দ্র।'

খুসি হয়ে বললেন, 'ইন্দ্র ? তা ইন্দ্রই বটে, চাঁদের মাটিতে প্রথম পা দেবার গৌরব হবে যার সে ইন্দ্রের চেয়ে কোন্ দিকে কম বলো দিকিনি।'

চারপাশের লোকজনেরা বলতে লাগলো, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

আমার চক্ষু ছানাবড়া। চাঁদে যাবো নাকি আমি ?

বললাম, 'সে আমার যেতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু একা যাবো না। তাছাড়া, আবার ফিরে আসবো তো ? ডিসেম্বরে আমার ক্রিকেট

ম্যাচের টিকিট বলা আছে কিন্তু।'

সেজমামা আর মনোহরবাবু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। শেষে মনোহরবাবু বললেন, 'তা হ্যাঁ—তা ফিরে আসবে বইকি, যাবে আর আসবে না, সে কি একটা কথা হল নাকি! কিন্তু আর দেরি কিসের জন্য? চলো তো দেখি ইন্দ্র, আমার সঙ্গে!'

গেলাম বাগান পেরিয়ে একটা জায়গায়। তার মাথার ওপর দিয়ে লম্বা একটা কী বেরিয়ে রয়েছে, বিকেলের পড়ন্ত রোদে চিকচিক করছে, আগাটা ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে।

বেড়ার দরজা চাবি দিয়ে খুলে মনোহরবাবু সরে দাঁড়ালেন, আমিই আগে ঢুকলাম।

গিয়ে যা দেখলাম সে আর কী বলবো। আগাগোড়া অ্যালুমিনি-য়মের মতো কী ধাতু দিয়ে তৈরি কী একটা বিশাল যন্ত্র অবিকল উড়ুক্কু মাছের মতো দেখতে, তবে ডানাগুলো অনেক ছোটো আর পিছন দিকে বেঁকিয়ে বসানো। দেখলেই বোঝা যায় যে একবার ছেড়ে দিলেই অমনি সুড়ুৎ করে তীরের মতো ওপরে উঠে নীল আকাশের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। চাঁদে যাওয়া এর পাক্ষ সেরকম কিছুই শক্ত হবে না।

নিচে একটা গোল প্লাটফর্ম ওটাকে চারিদিকে ঘিরে আছে, সেটাই প্রায় একতলার সমান উঁচু হবে, তারো নিচে যন্ত্রটার আরো অনেক-খানি রয়েছে। রূপোলি গায়ে কালো দিয়ে লেখা 'ধূমকেতু'। আর একজোড়া এই বড় বড় চোখ আঁকা। আশেপাশে কতো রকম যন্ত্র দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, বোঝা গেলো—একবার সেইগুলো খুলে দিলেই আর দেখতে হবে না।

মনোহরবাবু চোখ ছোটো করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হালকা হওয়া চাই। এই বেদে, দেখ তো ওর পকেটে কী।'

বেদে বলে লোকটা এগিয়ে আসতেই বললাম, 'এই খবরদার, তাহলে কিন্তু চাঁদে যাবো না বলে রাখলাম।'

মনোহরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ওরকম করিসনে বাপ, চাঁদে যাবি না কী রে? তুই না গেলে কে যাবে বল দিকিনি? কেউ রাজিও

হবে না, তাছাড়া তোর প্যাণ্টের মাপে সব তৈরী ! এখন না গেলে যে আমার জীবনের সব কাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে। বলছি, আমার শালাকে বলে তোকে মোহনবাগান ক্লাবের লাইফ-মেম্বার করে দেবো।'

ওঁর হাত ধরে বললাম, 'দেবে তো ঠিক ? বাবা—সেজমামা কতো চেষ্টা করেও হতে পারেনি। শেষটা কিন্তু অন্যরকম বললে—'

মনোহরবাবু রেগে উঠলেন, 'বলছি করে দেবো, আবার অতো কথা কিসের ? ফিরে তো এসো আগে।'

বেদে বললো, 'যদি আসো।'

মনোহরবাবু তাকে ধমক দিলেন, 'তোমাকে অতো কথা বলতে কে বলেছে বাছা ? যাও, নিচে গিয়ে পাওয়ার লাগাও দিকিনি, নইলে—'

বেদে অমনি একটা ছোটো; সিঁড়ি দিয়ে যন্ত্রের তলায় চলে গেলো।

সেজমামা মনোহরবাবুকে বললেন, 'ফিরে আসার কলকব্জাগুলো ওকে বুঝিয়ে দিও মনোহর।'

মনোহরবাবু বললেন, 'ও কি ওর বাবা-মার একমাত্র সন্তান ?'

আমি বললাম, 'আরে না না, আমার ছুটো ভাই ছুটো বোন !— আচ্ছা, লাইফ-মেম্বার করে দেবেন তো ? কারণ বাবা হয়ত চাঁদা দেবেন না।'

মনোহরবাবু বললেন, 'তাই দেবো। পকেটে কী আছে বের করে এইখানে রাখো তো দেখি।'

মেশিনের তলা থেকে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হল, তারপর কেমন শোঁ-শোঁ করতে লাগলো ! মনোহরবাবু একবার নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিলেন। আমি পকেট থেকে লাট্টু, লেত্তি, ইয়ো-ইয়ো, রুমাল, নীল গুলি, রুমেনিয়ার ছুটো ডাকটিকিট—মনাদা দিয়েছিলো— আধঠোঙা নরক ঝাল ছোলা ভাজা, টর্চ, আমার বড় গুলতিটা আর এক কৌটো শট বের করে রাখলাম। মনোহরবাবু তো অবাক !

'এ-সব কিচ্ছু নেবার দরকার নেই, শুধু ওজন বাড়ানো। খালি এই নোট বই আর পেনসিলটা নেবে। কী দেখবে, না দেখবে, শরীরে

কেমন বোধ করবে, সব টুকে রাখবে। আর এই হাতঘড়িটা নেবে, এতে কখন পৌঁছোলে ইত্যাদি—ও কি হলো, চলে যাচ্ছো যে।'

আমি বললাম, 'গুলতি শট না দিলে আমি যাবো না।'

সেজমামা বললেন, 'থাকগে মনোহর, এখন মনে হচ্ছে, তুমি বরং আর কাউকে দেখো!'

মনোহরবাবু বললেন, 'বেশ, তাহলে আমার হাজার টাকা ফিরিয়ে দাও, আমি এক্ষুণি অন্য লোক দেখছি।'

সেজমামা চুপ। আমি বললাম, 'তাতে কী হয়েছে সেজমামা? আমার গুলতি দিলেই আমি যাবো। অবিশ্যি বড্ড খিদে পেয়েছে, তাই আগে খানিকটা খেয়েও নেবো। আর বলেছি তো—একা যাবো না।'

মনোহরবাবু চটে গেলেন, 'একা যাবো না আবার কী? জানো, ঐ কাকাতুয়াটা আর বেড়ালটা দু-তিনবার একা গেছে, কিচ্ছু বলেনি।'

বললাম, 'চাঁদ অবধি গেছে?'

মনোহরবাবু বললেন, 'চাঁদ অবধি গেছে কিনা বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলেই তো তোমাকে পাঠানো হচ্ছে। নিদেন তোমার খাতা পেনসিলটা ঐ যে ছোটো হাউই-মতন দেখছো, ওটাতে পুরে ফেলে দিতে পারবে তো, নিজে যদি নেহাতই—আচ্ছা সে যাকগে, এখন এই বড়িটা খাও দিকিনি, কেমন পেট ভরে যায়, দেখো।'

বলে আমার মুখে কী একটা হলদে বড়ি পুরে দিলেন, সে যে কী আশ্চর্য বড়ি আর কি বলবো! খেতেই মনে হলো, আমি লুচি মাংস চপ কাটলেট ভেটকি-ফ্রাই চিংড়িমাছের মালাইকারি রাবড়ি কেক চকোলেট ছাঁচিপান সব খাচ্ছি! একেবারে পেট ভরে গেলো। সেই বড়ির শিশিটা আমার হাতে দিয়ে মনোহরবাবু বললেন, 'এই নাও এক মাসের খোরাক। একটার বেশি দুটো বড়ি কোনোদিন খেও না, খেলেই পেটের অসুখ করবে, মোটা হয়ে যাবে, যন্ত্রের ভেতর আঁটবে না। এসো, এই আরাম কেদারাটাতে বসে পড়ো দিকিনি। হাওয়ার কোনো অভাব হবে না, এমন কল করেছি ভেতরে তোমার

নিশ্বাসই আবার অক্সিজেন হয়ে যাবে।'

বলে সেই লম্বা চোঙার মত যন্ত্রটার গায়ে একটা দরজা খুলে, আমাকে একটা চমৎবার হাওয়ার গদিআঁটা-চেয়ারে বসিয়ে দিলেন আর মাথার ওপর দিয়ে একটা অদ্ভুত পোশাক পড়িয়ে দিয়ে কোমরে চেয়ারের সঙ্গে বগলেস এঁটে দিলেন। মুখের জায়গাটা বোধহয় অভ্র দিয়ে তৈরি, সব দেখতে পাচ্ছিলাম। নাকের কাছে ছ্যাঁদা, নিশ্বাস নিতে পারছিলাম। তারপর দেখি, সেজমামা তাড়াতাড়ি আমার জিনিসপত্র নিজের পকেটে ভরছেন। চেঁচিয়ে বললাম, 'গুলতি দিলে না? গুলতি না দিলে যাবো না, বলেছি না।'

অভ্রের মুখোসের ভেতর থেকে কথা শোনা গেলো কিনা, জানি না। কিন্তু সেজমামার বোধ হয় একটু মন কেমন করছিলো, কাছে এসে কি যেন বলতে লাগলেন, একবর্ণও শুনতে পেলাম না, যন্ত্রের-শোঁ-শোঁ গোঁ-গোঁতে কান ঝালাপালা! দারুণ রেগে গিয়ে সেজমামার কাছা আঁকড়ে ধরে চেঁচাতে লাগলাম, 'দাও বলছি, গুলতি না নিয়ে আমি কোথাও যাই না।'

এদিকে মনোহরবাবু বার বার ঘড়ি দেখছেন, যন্ত্রটা কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠছে, অথচ আমি এমন করে সেজমামার কাছা আঁকড়েছি যে দরজাটা এঁটে দেওয়া যাচ্ছে না। শেষটা হঠাৎ রেগেমেগে ঠেলে সেজমামাকে সুদ্ধ ভেতরে পুরে দিয়ে মনোহরবাবু দরজা এঁটে দিলেন।

বাব্বা! দিব্যি ফাঁকা ছিলো ভেতরটা, সেজমামা ঢোকাতে একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে গেলো। নড়বার-চড়বার জো রইলো না। দরজা বন্ধ করাতে বাইরের শব্দ আর কানে আসছিল না, সেজমামা চিৎকার করতে লাগলেন, 'ও মনোহর, ফেরবার কল শিখিয়ে দিলে না যে, ফিরবো কি করে?'

তা কে কার কথা শোনে। ভীষণ জোরে দুলে উঠে বোঁ করে যন্ত্রটা আকাশে উড়ে গেলো। একবার মনে হলো, চারদিকে চোখ-ঝলসানো আলো, তারপরেই মনে হলো ঘোর অন্ধকার।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো, বুঝলাম চাঁদে পৌঁছে গেছি। যন্ত্রটা আর

নরছে না চড়ছে না, কাত হয়ে পড়ে আছে, আমি বসে বসেই শুয়ে আছি, সেজমামা আমার তলায় একটু একটু নড়ছেন-চড়ছেন। মুখ তুলে কানের কাছে বললেন, 'আমার ডান পকেটে তোর টর্চটা আছে, দেখ তো নাগাল পাস কিনা ?'
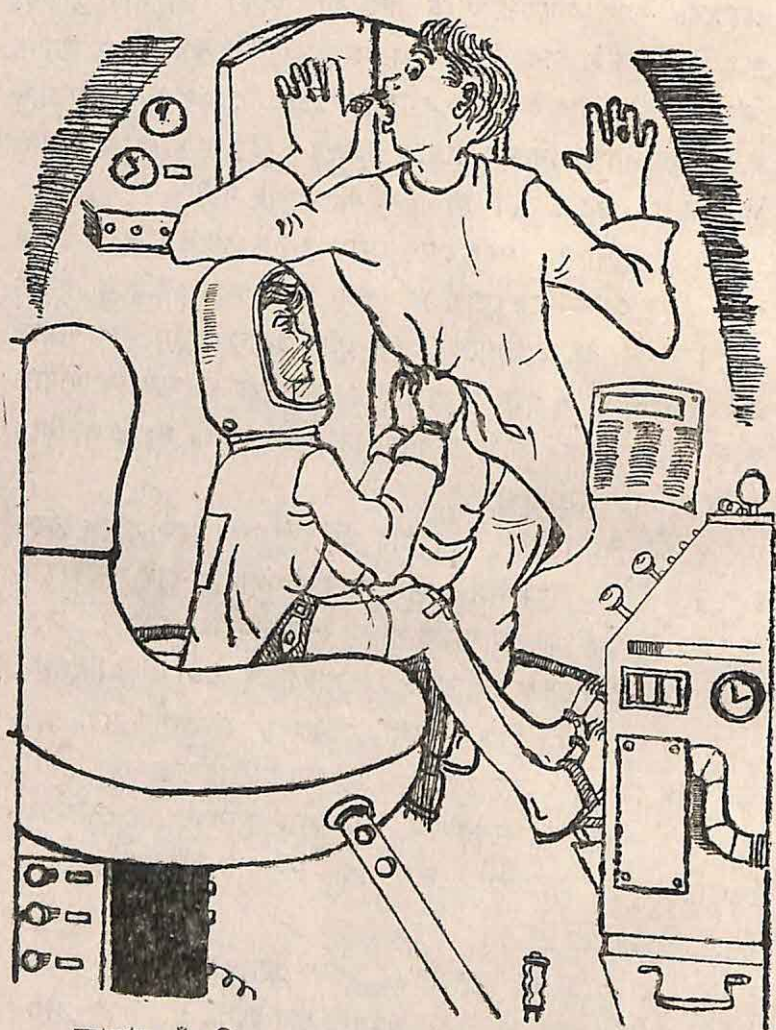
বুঝলাম, ওঁর নিজের হাত নাড়বার জায়গা নেই। হাতড়ে হাতড়ে ঠিক পেলাম। ভয়ে ভয়ে জ্বালালাম, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যন্ত্রের ভেতরটা ভালো করে দেখলাম, ভেতরকার কলকব্জা সব ঠিক আছে, যে-যার

জায়গায় আটকানো। হাত দিয়ে আমার বাঁ-পাশের জীপ ফাস্‌নার খুলে মুখোস নামিয়ে ফেললাম!

অমনি এক ঝলকা ঠাণ্ডা বাতাস এসে মুখে লাগলো। আঃ, চাঁদের বাতাসই আলাদা রে, এ পৃথিবীতে সেরকমটি হয় না।

সেজমামা বললেন, 'খাসা উড়ো কল বানিয়েছে তো মনোহর। বলেইছিলো যে নামবার সময় এতটুকু ঝাঁকানি লাগবে না। এতটুকু ভাঙবে না, টসকাবে না।'

আমি এদিকে টর্চ ঘুরিয়ে দেখি, পড়বার সময় কাত হয়ে যাওয়াতে দরজার বাইরের ছিটকিনি গেছে খুলে, দরজা এখন হাঁ।

বললাম সে কথা সেজমামাকে, কিন্তু আমি না সরলে তাঁর নড়বার উপায় নেই। তখন কোমরের বগলেস খুলে সেজমামার পেটের ওপরে দুই পা রেখে এক লাফে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে পড়া আমার কাছে কিছুই নয়। পৃথিবীতে যখন থাকতাম এরচেয়ে কতো উঁচু জায়গা থেকে লাফাতে হয়েছে। সেজমামা শুধু একটু কোঁৎ করে উঠলেন।

বেরিয়ে বুঝলাম, বোঁধ হয় চাঁদের কোনো একটা নিবে যাওয়া আগ্নেয়গিরির মুখের মধ্যে পড়ে গেছি। চারদিকে মনে হলো নরম ঘাস, মাথার ওপর তারাও দেখতে পেলাম, আবার এক কোণা দিয়ে বোধ হয় আমাদের এই পৃথিবীটাকেই একবার একটু দেখতে পেলাম! ঠিক যেন আর একটা চাঁদ। মনে হলো, আফ্রিকাটাকে যেন একটু একটু দেখতে পেলাম। তারপরেই আবার সেটা টুক করে ডুবে গেলো।

তখন কানে এলো যন্ত্রের ভেতর থেকে সেজমামা মহা চেঁচামেচি লাগিয়েছেন, 'টর্চরে আলো দেখা, আমিও নামবো।'

অনেক কষ্টে নেমে আমার পাশে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেই বললেন, 'খিদেয় পেট জ্বলে গেলো, সেই বড়ি একটা দে-না।'

টের পেলাম, আমারও বেজায় খিদে পেয়েছে, দুজনে দুটো বড়ি খেলাম, তারপর ঘাসের ওপর শুয়ে থেকে থেকে অন্ধকারটা একটু চোখসওয়া হয়ে এলো। আমরা যে একটা বেশ বড়ো গর্তের মতো

জায়গাতে শুয়ে আছি সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই, ঠিক যেন একটা বিরাট পেয়ালার মধ্যে রয়েছি। একটু ঘুম-ঘুম পাচ্ছিলো।
সেজমামা বললেন, 'কী রে, উঠে একটু দেখবি না?'

বললাম, 'ভোর হোক আগে।'

সেজমামা বললেন, 'আবার ভোর কী রে? এটা যদি চাঁদের উল্টো পিঠ হয়ে থাকে তাহলে তো ভোরই হবে না।'

এবারে উঠলাম। 'তাই-ই নিশ্চয় সেজমামা। এ পিঠটাতে তো সর্বদা আলো থাকে। দিনের বেলাও তাই দেখছি, রাতেও দেখেছি।'

"ফোঁস।"

তিন হাত লাফিয়ে উঠলাম। ফোঁস করলো কী? তবে কি চাঁদে হিংস্র জন্তুও আছে? বুকটা টিপটিপ করতে লাগলো। কিন্তু স্পষ্ট শুনলাম জন্তুটা কচর-মচর করে নরম ঘাসগুলোকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সেজমামা বললেন, 'তবে কোনো ভয় নেই। ওরা নিরামিষ খায়।'

আবার শুনলাম জোরে একটা ফোঁস ফোঁস! আমার মোটেই ভালো লাগলো না। সেজমামা কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'কী হবে রে?'

'কী আবার হবে?' এক নিমেষে গুলতিতে শট লাগিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে দিলাম ছেড়ে। অমনি সে যে কী চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেলো, সে আর কী বলবো। একটা কেন, মনে হলো এক লাখ জানোয়ার একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে। সেই চেঁচানি শুনে চাঁদের মানুষেরা জেগে উঠে সব বড়ো বড়ো মশাল নিয়ে পেয়ালার একদিকের কানা বেয়ে নামছে, দেখলাম। কী হিংস্র সব চেহারা! কী ষণ্ডা, পৃথিবীর মানুষদের চেয়ে তিনগুণ জোরালো। আর সে কী গর্জন, কান ফেটে যায়।

আর এক মিনিট অপেক্ষা করলাম না। তারা হয়তো ঐ অন্ধকারে আমাদের দেখতে পেলো না। পড়ি-মরি প্রাণপণ ছুটে অন্য ধারের ঘাসে ঢাকা ঢালু দেওয়াল বেয়ে পিঁপড়ের মত আমরা উঠে গেলাম।

শরীরে আর এতোটুকু ক্লান্তি বোধ করলাম না।

ওপরে উঠিই ছুট লাগালাম। আন্দাজে অন্ধকারের মধ্যে দু-পা-না যেতেই চাঁদের পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুপ করে খানিকটা পড়েই গড়াতে লাগলাম।

সব সইতে পারি বুঝলি, শুধু ঐ গড়ানিটা আমার সহ্য হয় না। তখনি মুচ্ছো গেলাম।

আবার যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখি সেজমামা আমার মুখে-চোখে ঠাণ্ডা জল ছিটোচ্ছেন। আমি নড়ে উঠতেই বললেন, 'বাপ, বেঁচে আছিস্ তা হলে? দাঁড়া, গাড়িটা আনি, আর এখানে নয়, চল্ একে-বারে ভোরের গাড়িটা ধরা যাক।'

সেজমামা গাড়ি আনতে গেলেন, আমি একটা পাথরে ঠেসান দিয়ে বসে ভাবতে লাগলাম। আস্তে আস্তে মাথাটা খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এলে বুঝলাম, কুণাল মিত্তিরদের টিলার নিচেই এসে পড়েছি। সেজমামা গাড়ি আনতেই বললাম, 'কী আশ্চর্য, না সেজমামা? যেখান থেকে চাঁদে গেলাম আবার ঠিক সেই একই জায়গায় এসে নামলাম।'

সেজমামা বললেন, 'আশ্চর্য বইকি। আমরা যে বেঁচে আছি সেটা আরো আশ্চর্য!'

তাই তো, যন্ত্রটা চাঁদেই পড়ে আছে। পকেট হাতড়াতে লাগলাম। সেজমামা বললেন, আবার কী?

'কেন, সব লিখে রাখতে হবে না? ওখানে ঠাণ্ডা বাতাস আছে, জন্তু মানুষ সব আছে—।'

সেজমামা বললেন, 'সে আমি মনোহরকে বলে দেব'খন। আর দেখ, এ-সব কথা খবরদার বাড়িতে বলবি নে।'

বাবা-মা'রা আমাদের দেখে অবাক।—'এ কী, কাল গেলে আজই ফিরে এলে?'

সেজমামা বললেন, 'সেখানে মহামারী লেগেছে। আমাকে আজই ফিরে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।' এদিকে আমি কাউকে কিছু

বলতে পারছি না, পেট ফেঁপে মরি আর কি !

ছোটকাকা থামলে আমরা বললাম, 'তবে কেন বললে, একরকম বলতে গেলে চাঁদে গিছলে ?' ছোটকাকা বললেন, 'তার কারণ এই ঘটনার মাস চারেক বাদে মা হাতে করে সেজমামার একটা চিঠি নিয়ে বাবাকে বললেন, 'শোনো একবার কাণ্ড। ঐ যে আমাদের কুণাল মিত্তিরের ছেলে মনোহর না, সে নাকি এক উড়োজাহাজ বানিয়ে, যেখানে কুণাল মিত্তিরের গবেষণা-গরুগুলো চরছিলো সেখানে নামিয়ে একাকার কাণ্ড করেছে। কুণাল মিত্তির দারুণ রেগে ওকে চাকরি দিয়ে বোম্বাই পাঠিয়েছেন।'

বাবা বললেন, 'গবেষণা-গরু আবার কী জিনিস ?'

মা বললেন, 'ওমা, তাও জানো না ? কুণাল মিত্তির একরকম বড়ি বানিয়েছেন, তাতে সব রকম পুষ্টিকর জিনিস আছে, সে খেলেই পেট ভরে যায়। ঐ টিলার মাথায় খানিকটা জায়গাকে পুকুরের মতো করে কেটে, অবিশ্যি তাতে জল নেই, সেখানে গরুগুলো ছাড়া থাকতো, ঐ বড়ি খেতো আর মন ভাল করবার জন্য একটু একটু ঘাসও চিবোতো। বাইশ সের দুধ দিতো এক-একটা। ব্যাটা লক্ষীছাড়া মনোহর সেইখানে উড়োজাহাজ নামিয়েছে। ব্যস, আর যাবে কোথা, গরুরা সব দুধ বন্ধ করে দিয়েছে। কুণাল মিত্তির রেগে টং। ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়ে, এখন বলে নাকি ছেলের কোনো দোষ নেই, চমৎকার উড়োজাহাজ করেছে, কিন্তু পাড়ার কয়েকটা দুষ্টু লোক মিলেই নাকি ওর মাথাটা খেলো। শুনলে একবার !'

আমি আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে গিয়ে গুলতিটা বের করে কাগদের মারতে লাগলাম।

'হ্যারে, তোরা এখানো বসে রয়েছিস যে, আমাকে কি বইটা শেষ করতে দিবি না ? এই বলে ছোটকাকা আবার পা মেলে দিয়ে বই পড়তে লাগলেন।

ভয়

ছাপাখানাটি খুব ছোট হলেও সারাদিন সেখানে কাজ হত। ছুটি হতে হতে সেই সন্ধ্যে হয়ে যেত। ছাপাখানার পাশে একটা চায়ের দোকান ছিল। কুড়ি পয়সা দিলে এক ভাঁড় গুড়ের চা আর ঝালঝাল আলুচচ্চড়ি দিয়ে মোটা একটা হাতরুটি পাওয়া যেত। খেয়েই বঙ্কু রওনা দিত। ছুটো বাড়ি, তারপরেই বন। এ-সব জায়গায় কোথায় শহর শেষ হয়ে বন শুরু হল বলা মুস্কিল। শহর বলতে অবিশ্যি খুবই ছোট শহর। গ্রামও বলা চলে। তবে ছাপাখানায় অনেক বাইরের লোক কাজ করত। তারা ঐ গ্রামেই থাকত। গ্রাম বললে চটে যেত, বলত ছোট শহর।

বনের মধ্যে শালগাছই বেশি। মাঝে মাঝে পলাশ, মহুয়া, শিমুল, বুনো তাল। দিনের বেলায় চমৎকার। সন্ধ্যে হলেই মুসকিল। ছায়া-ছায়া; অদ্ভুত সব শব্দ। গুরু-শিষ্য প্যাঁচা ডাকে। বনের নাম ঘনার বাদা। এককালে এখানেই কুখ্যাত ঘনা-ডাকাতের আস্তানা ছিল। সে প্রায় একশো বছর আগে। তখন কি দিনে কি রাতে, কেউ পারলে এ-বনের ধারে-কাছে আসত না।

রাতে এখানো আসে না। দিনে মধু আর আঠা নিতে এলেও, রাতে আসে না। ঘনা নাকি এখনো ডাকাতি ছাড়ে নি। অনেকে নাকি দূর থেকে তাকে দেখে অমনি চোঁ-চোঁ দৌড় দেয়।

বঙ্কুর নাইট-স্কুলটা বনের ওপারে। লেখা-পড়া শিখতে হলে কষ্ট করতে হয়। বাবার ডান পা কাটা গেছে, পেনশন যা পায় তাতে ওদের চলে না। তাই বঙ্কুকে ওদের হাইস্কুল ছেড়ে, এই নাইট স্কুলে পড়তে যেতে হয়। অন্য দিন সঙ্গে লখা থাকে। ওর বন্ধু লখাও ছাপাখানায় কাজ করে। দুজনে থাকলে ভয় করে না। ঘনা একা, লোক খোঁজে।

তখনো আলো ছিল। হয়তো ছ'টা বেজেছিল। শাল গাছের

ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছিল। পাখি ডাকছিল। ঝোপে-ঝাড়ে খুস্-খুস্ খর-খর। বঙ্কু আধ ঘণ্টার মধ্যে বন পার হয়ে, বন-বিভাগের আপিসের গায়ে লাগা নাইট স্কুলে পৌঁছে-গেল।

বঙ্কুর বয়স চোদ্দ। আর তিন বছরে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে, ছাপাখানার কাজ শেখার স্কুলে ভরতি হবে। পরীক্ষার জন্যেও তৈরি হবে, আবার রোজ পাঁচ ঘণ্টা কাজ করার জন্য মাইনেও পাবে। আরো তিন বছর পরে পাস করে বেরুলে সরকারী কাজ পেয়ে যাবে। মা-বাবা সেই আশাতেই আছেন। ছোট বোন নুটুও বলে, "দাদা আমাকে বড় পুতুল কিনে দেবে।"

তাই মন দিয়ে পড়ে বঙ্কু। পড়তে পড়তে ভাবে এরপর আবার বন পার হতে হবে। একা। এক সময়ে ছুটি হয়ে গেল। তখন রাত ন'টা। বঙ্কু আজ একা বনের পথ ধরল। সঙ্গে আলো ছিল না। আলো কোথায় পাবে, টর্চের বড্ড দাম। একটা বটগাছের কোটরে লখা কয়েকটা শুকনো বাঁশের আগা ছেঁচে শুকনো পাতা জড়িয়ে মশাল বানিয়ে, লুকিয়ে রেখেছিল। বঙ্কু সেই একটা বের করে শহরের শেষ পান-বিড়ির দোকান থেকে ধরিয়ে নিল।

জগাদা বলল, "একা যাচ্ছিস নাকি? আজ আবার অমাবস্যা। লখা কোথায়?" "লখার জ্বর।" "না হয় আমার এখানে চাট্টি খেয়ে শুয়ে রইলি। সকালে বাড়ি যাস্।"

"মা-বাবা ভাববে, জগাদা।"

মশাল ধরিয়ে বঙ্কু রওনা হল।

মশালে যেমন আলো-ও হয়, তেমনি আবার মনে হয় চারিদিকে গাছের ছায়াগুলো নড়ছে-চড়ছে। বঙ্কু পা চালিয়ে এগোতে লাগল। হঠাৎ শুনল ছোট ছেলের কান্না। বঙ্কুর গায়ের রক্ত হিম। ও নিশ্চয় সত্যিকার ছোট ছেলের কান্না নয়, অন্য কিছুতে ওকে ভোলাবার জন্য ঐ রকম শব্দ করছে।

কোনো দিকে না তাকিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল বঙ্কু। ছোট ছেলেটার কান্না থামল না। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে, আবার

ফোঁপাতে থাকে। নুটু আগে ঐ রকম করে কাঁদত!

বঙ্কু মশাল নিয়ে চারিদিক খুঁজতে লাগল। জায়গাটা বড্ড ঘুপ্‌সি। তার মধ্যে বেদেরা খরগোশ ধরবার ফাঁদ পেতে রেখেছিল। কামড়ানো ফাঁদ। গোটা দুই খরগোশ পড়েছিল আর একটা ছোট ছেলে।
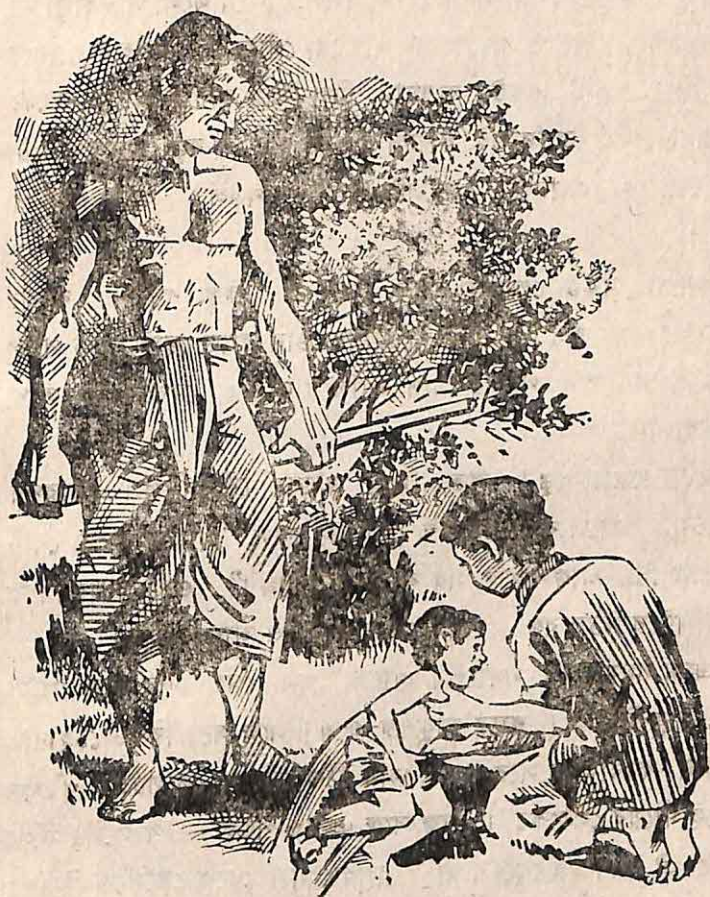
কাঠুরেদের ছেলে কি না কে জানে। এ জায়গা ভালো না। এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু ছেলেটার মুখে আলো পড়তেই, বঙ্কু দেখল তার চোখের কোণে জল জমেছে, ঠোঁট কাঁপছে। হয়তো বছর তিনেক বয়স। বঙ্কু তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ফাঁদের কাটা কাটা দাঁতগুলো

তার একটা পায়ে কামড়ে বসেছিল। সঙ্গে একটা সবুজ ডালেও কামড় পড়েছিল বলে পা-টা কেটে পড়ে যায় নি।

হঠাৎ কানের কাছে ফোঁস্ শব্দ শুনে দেখে কুচকুচে কালো একটা লোক, কপালে কাটার দাগ, লাল লাল চোখ, উঁচু উঁচু দাঁত, বিকট চেহারা। কিন্তু লোকটা নরম গলায় বলল, "টেনে খুলো না, বাপু, পা কাটা যাবে। দাঁতের ফাঁকে ঐ পাথরটা গোঁজ।" মশালটা পাথরে ঠেকা দিয়ে, ছোট একটা অসমান ঢিল নিয়ে আস্তে আস্তে ফাঁদের দাঁতের ফাঁকে গুজে দিতেই, ফাঁদের হাঁ বড় হল। বঙ্কু ছেলের ঠ্যাংটা টেনে বের করে আনল। ছেলেটা নেতিয়ে পড়ল। বঙ্কুর হাত পা ঠাণ্ডা!

কালো বিকট লোকটা বলল, "না, না, কিছু হয়নি। ব্যথার চোটে অচৈতন্যি হল। ঐ যে তোমার ডান হাতে ছোট ছোট পাতা দেখছ, ঐ খানিকটা পাথরে ঘষে লাগিয়ে দাও। দেখতে দেখতে ঘা সেরে যাবে।"

তাই করল বঙ্কু। লতা দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে দিল। তারপর ছেলেটাকে কোলে করে উঠতেই, লোকটা বলল, "আমার পা-টা কেউ বাঁচায়নি গো, আঙ্গুলগুলো সব কাটা পড়েছিল।" ওর পায়ের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল বঙ্কু। ডান পায়ে একটাও আঙ্গুল নেই।

এমন সময় দূরে মশালের আলো দেখা গেল আর ডাক শোনা গেল, নাকু-উ-উ-উ। হারে নাকু-রে-এ-এ! সঙ্গে সঙ্গে বিকট চেহারার লোকটা কোথায় যে সরে পড়ল, তার ঠিক নেই। ছেলেটাকে খুঁজতে এসেছে গাঁয়ের লোকেরা। সঙ্গে সঙ্গে এসেও পড়ল। পাগলের মতো চেহারা ঐ বোধ হয় ছেলের মা। বঙ্কুর কোল থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে, বারবার সে বলতে লাগল, "বাঁচি থাক্, সুখী হ, ভগবান তোর ভালো করুক।"

কাঠুরেদের ছেলেটা নাকি ভারি-তুরন্ত! কেমন করে দল-ছাড়া হয়ে গেছিল। তারপর হাসতে হাসতে সবাই দল বেঁধে গ্রামে ফিরল। ছেলের বাপ হঠাৎ বলল, বড় বাঁচিয়েছিস্, বাপ্ ঘনার হাতে

পড়লে উকে আর দেখতে পেতাম না। ঘনা বড় ভয়ঙ্কর।"

বঙ্কু বলল, "কেমন দেখতে ঘনা ?"

"কি জানি। কাছে গেলে তো নিঘ্যাত মৃত্যু ! শুনেছি কালো কুচকুচে, কপাল কাটা আর ডান পায়ে একটাও আঙ্গুল নেই। বড় ভয়ঙ্কর সে।"

বঙ্কুর বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল।

সে বলল, "না, না, ঘনা বড় ভালো, মোটেই ভয়ঙ্কর নয়।"

এরপর নাকি ঘনাকে আর কেউ কখনো দেখেনি।

বহুরূপী

বিকেল থেকে টিপিরটিপির বৃষ্টি পড়ছিলো। অনেক কষ্টে বড়পিসিমাকে দিয়ে বেগুনি ভাজানো হচ্ছিলো, তারি মধ্যে ফুলকাকা ছুটে এসে, রান্নাঘরে ঢুকে, দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, সেটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

তাঁর সে বিকট চেহারা দেখে যে-যেখানে ছিলো সেখান থেকে উঠে এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো; 'কী হলো ? কিছুতে ভয় দেখিয়েছে ? কেউ কামড়েছে ? পাছু নিয়েছে ?' ফুলকাকা শিউরে উঠে বললেন, 'ঠাট্টা নয়। চেতলার পুল থেকে আমাকে বাঘে তাড়া করেছিলো।'

শুনে সকলের সে কী হাসি। চেতলার পুলের নীচে হুলো বেড়াল, কি বেজি, নিদেন রাগী ভোঁদড় ইত্যাদি থাকা কিছু বিচিত্র নয়। তারি একটা হয়তো—

বড়পিসি এক খোলা বেগুনি নামিয়ে বললেন, 'কলকাতা শহরে বাঘ কীরে ? হ্যাঁ, ছিলো বটে বাঘ যখন দুশো বছর আগে ঠাকুরদার ঠাকুরদা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ন্যাজ ধরে কলকাতায় এসে এই কালীঘাটের এই বাড়িটি পত্তন করেছিলেন। আজ পর্যন্ত এতোটুকু

টস্কায়নি দেখেছিস ? তখন দেশের দুষ্টু লোকেরা কী না বলেছিলো ! যার রোজগারপাতি নেই, ধার ছাড়া সম্বল নেই, সে কী করে কালী ঘাটের মতো জায়গায় ইটের তৈরি বাড়ি করে, হেনা তেনা কতো কী ! ইদিকে তখন বাঘ-বাঘেল্লা কিলবিল করতো !'

ফুলকাকা চটে বললেন, 'বড়দি, তুমি থামবে কি না ? বাঘ নয়তো খিড়কি-দোরে আঁচড়াচ্ছে কীসে ?' শুনে সবার দু'কান খাড়া। বাস্তবিক-ই খিড়কি-দোরের বাইরে খচর-খচর করে কিছুতে বড় বড় নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছিলো।

ফুলকাকা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'আশা করি এবার তোমাদের বিশ্বাস হয়েছে ? বলে আমি চেতলার পুলের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সবে পার হয়ে এসেছি, অমনি স্যাৎ করে পুলের তলা থেকে বেরিয়ে এসে, জোড়াপায়ে লাফাতে-লাফাতে আমার পেছনে ছুটেছে, এ্যাঁ ! সেই ইস্তক আমি বাঘের তিন হাত সামনে-সামনে দৌড়তে দৌড়তে কোনো মতে প্রাণ হাতে করে বাড়ি পৌঁছেছি, উফ্ !'

বড়পিসি বললেন, 'অতো জোরে ছোটা তোর কোনো মতেই উচিত হয়নি ভূতো। ছোটোবেলা থেকে বেশি খেয়ে-খেয়ে তোর না ব্লাডপ্রেসার ?'

ফুলকাকা হাঁপাতে ভুলে গিয়ে, তেরিয়া হয়ে উঠলেন ! 'অত জোরে ছুটবো না তো কি বাঘের পেটে যাবো ? ঐ শোনো, শিকার হাত-ছাড়া হওয়াতে কী তার আস্ফালন !'

বড়পিসি বললেন 'দোরটা বন্ধ আছে তো ?'

'আছেই তো। নইলে আর দেখতে হোতো না, এতোক্ষণে জলযোগ শেষ করে উঠতো। ঢুকেই আমি ওটাকে বন্ধ করেছি আর ও-ও ওটার ওপর আছড়ে পড়েছে। ঢুকতে না পেরে নখ দিয়ে কেমন আঁচড়াচ্ছে শোনো !'

খচর—খচর—খচর—খচর—চিড়—চিড়—চিড়াৎ ! তার পর কী হোত বলা যায় না, কিন্তু মেজদা ঠিক সেই সময় এমনি অট্টহাস্য করে উঠলো যে বাকি সবাইতো আঁতকে উঠলোই, খচর খচর-শব্দ-ও চুপ।

ফুলকাকা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। 'ওটা কী হলো শুনি?' মেজদা ফক্কর-ফক্কর করে হাসতে হাসতে বললো, 'বাঘ না আরো কিছু! আজ না শুক্রবার, ঘটু বহুরূপী আসার দিন? গত হপ্তায় বড়জ্যাঠা ওকে কী না বললেন! কান দুটো ওর এমনি লাল হয়ে উঠেছিলো যে আমি ভাবলাম এবার না দপ্ করে জ্বলে ওঠে! এই ঘটে, ঢের হয়েছে, সবাই বেজায় ভয় পেয়েছে। আয় দিকিনি, ভালোয় ভালোয় ভেতরে।'

ততক্ষণে বৃষ্টিটা একটু ধরেছে।

পেছন দিকের দেওয়ালটা দু'মানুষ উঁচু, তাতে খিড়কি দোরটি বসানো। দরজাটিও বেজায় মজবুত। ঠ্যাঙাড়ে শত্রুর ঠেকাবার ব্যবস্থা
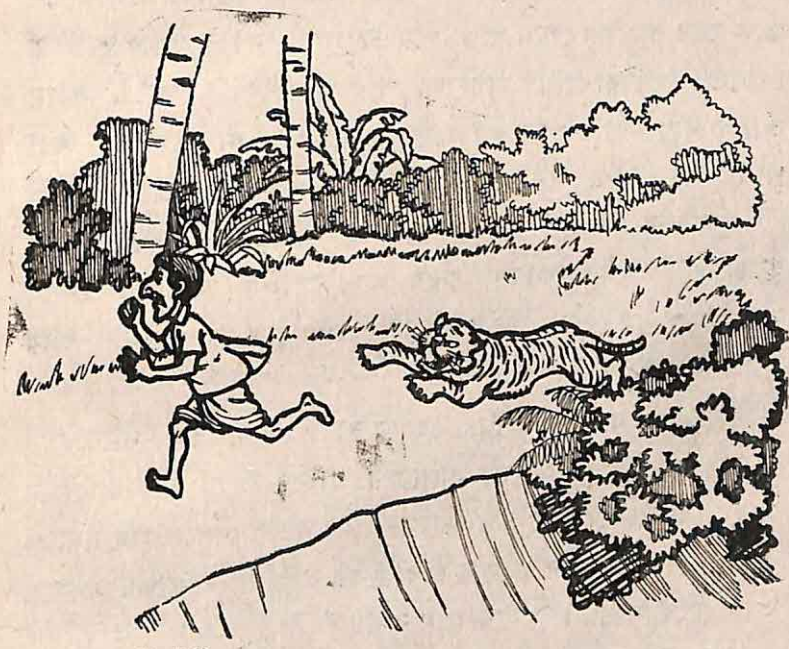
তো! ঐ উঁচু পাঁচিলের ওপরটাতে জাহাজঘাট থেকে ফেলে দেওয়া ভাঙা শিশি-বোতল আনিয়ে, সেগুলোকে বসানো হয়েছিলো। তার ওপর চড়ে কারো সাধ্য ছিলো না। বোমা পড়ার সময়, দোতলার লোকেদের পালাবার একটা দ্বিতীয় পথ রাখার জন্য বড়জ্যাঠা কাচগুলো তুলিয়ে ফেলেছিলেন। ঐ চব্বিশ ইঞ্চি পাঁচিল ভাঙা, কি

তার ওপর বেয়ে ওঠা খুব সহজ কাজ ছিলো না। কিন্তু দড়াম করে খিড়কি-দোর খুলে ফেলে সবাই অবাক! কোথায় ঘটু, কোথায় কী! গলি ভোঁ-ভোঁ! বড়জ্যাঠা বললেন, 'তোদের হম্বি-তম্বি শুনে ভয় পেয়ে, গা ঢাকা দিয়েছে।' সবাই মিলে তখন ডাকতে লাগলো, 'ঘটু, ঘটু, ঘণ্টেশ্বর! ঢের হয়েছে, খুব হয়েছে, সবাই বোকা বনেছি। এবার বেরিয়ে এসে সবাইকে নিশ্চিন্দি কর, বাপ্।'

ওপর থেকে ঘটু বললো, 'ঘ্—র্—র্—ঘ্—র্—র্—ফ্যাও—ফ্যাচ্।'

ওটা ঘটুর ডাক জেনেও সেই বর্ষার সন্ধ্যায় অন্ধকার গলিতে সে ডাক শুনে সকলের লোম খাড়া হয়ে উঠলো। সবাই ওপরে তাকিয়ে দেখলো ডোরাকাটা বাঘছাল পরে পাঁচিলের ওপরে, সমান জায়গাটাতে ল্যাজ পেতে ঘটু বসে! মুখে আবার বাঘ মুখোশ! ধরা পড়ার ভয়ে তরতর করে খাড়া দেয়াল বেয়ে ঐ অতটা উঠে গেছে!

ফুলকাকা সব চাইতে রেগে গেলেন, 'আবার ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করা হচ্ছে, পাজি কোথাকার! নেবে আয় বলছি! আধবুড়ো মোটা মানুষটাকে পুল থেকে এদ্দূর দৌড় করিয়েও বুঝি মন ওঠেনি? আয় না একবার নিচে!'

বড়জ্যাঠা বললেন 'আহা, ওভাবে হামলা করলে কেউ নাবে?'

মেজদা বললো, 'হাতের নাগালের বাইরে বসে ব্যাটার কেমন সাহস বেড়েছে দেখছিস্? এমনিতে তো বেড়াল দেখলে মুচ্ছো যায়! আমার হাঁটুটাতে যদি সেবার হকিস্টিকের বাড়ি না লাগতো, তাহলে আজ দেখে নিতাম। নেবে আয় বলছি!'

বড়কাকা গলির ওপারে বড়চৌধুরীদের রকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ও ব্বাবা! আবার দাঁত খিচোয়! বাঘ সেজে হতভাগার বেঘো মেজাজ হয়েছে দেখছি!'

তখন রেগেমেগে সবাই চ্যাচাতে লাগলো, 'এবার তোমাকে পয়সা পাওয়াচ্ছি, এসো না একবার কাছে!' ইত্যাদি স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিলো যে, শেষ দিনে এ-ভাবে সবাইকে ভয় দেখানোটা কিচ্ছু

বুদ্ধির কাজ হয়নি, তা সাজ যতই না ভালো হোক।

হঠাৎ মণ্টু, পণ্টু, জগা ইত্যাদি, যাদের এত রাতে গলিতে বেরোনোর কোনো মানেই ছিলো না, তারা আঙুল দিয়ে ঘটুর দিকে দেখিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগলো।

মেজদা বিরক্ত হয়ে বললো, 'কী হয়েছেটা কী?'

মণ্টু বললো, ঐ ছাখ, ঘটুদা ল্যাজ আছড়াচ্ছে, খিক্‌খিক——'

ঘটু চটে বলল ঘাঁউক।

ছোটরা সবাই চেঁচিয়ে বললো, 'ও ঘটুদা, ও-রকম কোরো না, হাসতে-হাসতে পেটের নাড়ি ছিড়ে যাবে। সত্যি-বাঘের চেয়েও ভালো বাঘ সেজেছো তুমি।'

ততক্ষণে বৃষ্টিও একেবারে থেমে গেছিলো আর হট্টগোল শুনে এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে পাড়াপড়শীরাও অনেকে বেরিয়ে এসেছিলো। প্রথমটা ব্যাপার দেখে আঁতকে উঠলেও শেষ পর্যন্ত সব শুনে সামনের বাড়ির বড়চৌধুরী বললেন, 'বাঃ! বেড়ে সাজ হয়েছে তো ঘটু বহুরূপীর! এতটা পারে তা তো ভাবিনি! প্রথমে সাজলো কী? না, সায়েব! আরে, ছো-ছো, আমাদের গোমেস কেরানীর কাছে ঐ সায়েব! তাপ্পর সাজলো গয়লানী। ঘটি নিলেই যদি গয়লানী হওয়া যেতো, তাহলে আর ভাবনা ছিলো না। পচার মা তো তার খদ্দের ভাগাবার চেষ্টা করছে বলে মামলা- টামলার ভয় দেখিয়ে চ্যালা কাঠ হাতে নিয়ে এসে ঐ রকম গয়লানী দেখে হেসেই কুটোপাটি!'

মনোজকাকা বললেন, 'আরেক দিন সাজলো মা-কালী! ভাবুন একবার একরকম কালীঘাটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মা-কালীর নকল করা! চিমড়ে বুকে সাহস কতো!'

খেতুবাবু বললেন, 'তবে মা-কালী সেজেছে না হনুমান সেজেছে, সেটাই বোঝা না যাওয়াতে, মা-কালী বোধ হয় লক্ষ্যই করেননি। ল্যাজ নেই সেটা নজরে পড়েনি।'

মণ্টু বললো, 'তার পরের দিন মেম সেজে রিকসো চেপে এসেছিলো। কিন্তু খাকী হাফ-প্যান্ট দেখা যাচ্ছিলো।'

গবু বললো, 'পিচবোর্ডের দশ-মুণ্ডু লাগিয়ে গত শুক্রবার রাবণ সেজেছিলো। খেলার মাঠ থেকে ফিরতে আমার দেরি হয়ে গেছিলো, গলির মুখে ঐ দেখে হাতে-পায়ে খিল ধরে আর কী! ভাগ্যিস ছেঁড়া কানওয়ালা দশ-মুণ্ডুর মুখোশটাকে চিনতে পারলাম, তাই রক্ষে! মনে নেই, গত বছর পুজোর যাত্রায় আমি রাবণের পাট নিয়েছিলাম?'

তারপর সবাই মিলে বলতে লাগলো, 'কিন্তু আজ আর কোনো খুঁত পাওয়া যাচ্ছে না রে ঘটু, তুই নিশ্চিন্তে নেবে আয়। প্রত্যেক বাড়ি থেকে তোকে দু টাকা করে দেওয়া হবে। তাছাড়া গন্ধ শুঁকে বোঝা যাচ্ছে, এদের বাড়িতে আজ খিচুড়ি মাংস রান্না হচ্ছে, তার-ও ভাগ পাবি। নিচে আয়।'

কেউ বললো, 'তোকে এই বলে সারটিফিকেট দেওয়া হবে যে, তোর মতো ভালো বাঘ চিড়িয়াখানাতেও নেই! নাম্ বলছি!' সম্ভবত এ রকম অসাধারণ সাফল্য লাভ করে, অহঙ্কারের চোটে ঘটুকে এক রকম বেঘো নেশায় ধরে থাকবে। কারণ নিচে নামার নাম না করে, সে শুধু বললো, 'ঘাঁউক্, ঘাঁউক্!'

হো-হো করে হেসে উঠে, ওপরে তাকিয়েই সকলের চক্ষু চড়ক-গাছ! বড়পিসি কোন্ সময় ন্যাড়াকে সঙ্গে নিয়ে দোতলার ট্যাঙ্কির ছাদে গিয়ে উঠেছেন। ন্যাড়া হলো গিয়ে নতুন রান্নার লোকটার নাম। ব্যাটা কিচ্ছু রাঁধতে জানে না, কিন্তু গায়ে ভাল্লুকের বল।

ট্যাঙ্কির ছাদের নিচে এসে খিড়কির পাঁচিলটা শেষ হয়েছে। ঠিক ঘটুর মাথার ওপরে ঝুঁকে পড়ে কটক থেকে আনা ডবল বুনোটের প্রকাণ্ড বিছানা-ঢাকাটি ঝুপ করে ঘটুর ওপরে ফেলে বড়পিসি তাকে আপাদমস্তক চাপা দিয়ে ফেললেন। সঙ্গে-সঙ্গে ন্যাড়াও তড়াক্ করে পাঁচিলের ওপর নেমে পড়ে তাকে পাটিসাপটার মতো জড়িয়ে-কোলপাঁজা করে ট্যাঙ্কির ছাদে তুলে দিলো। নতুন মোটা দড়িগাছি নিয়ে বড়পিসি সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। এবার দু'জনে মিলে তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন। দর্শকরা সবাই থ!

ন্যাড়া দু'হাত ঝেড়ে বললো, এবার বোঝ! হায়েব হেজে

আমাকে ভয় দেখানো !'

ততোক্ষণে বড়পিসি দোতলার বারান্দা থেকে বড়জ্যাঠার বড় মুগুরটা নিয়ে এসেছেন দেখে, নিচে থেকে সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আ—হা—হা, পিটবেন না দিদি, তাহলে মরে যাবে ! আমাদের কাছে পায়সা পায়, পরে যদি আবার নিতে আসে !'

ঠিক সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে চিঁ—চিঁ স্বরে কে বলতে লাগলো, 'আ সব্বনাশ ! আ সব্বনাশ ! ও কাকে পেটাচ্ছেন বড়-পিসিমা ? এই তো আমি এখানে, এখানে জ্বরে কোঁকাচ্ছি !'

সবাই ফিরে দেখে স্বয়ং ঘটু !

বড়পিসিমার হাত থেকে মুগুরটা ঠকাস্ করে পোঁটলার ওপর পড়ে গেলো। পোঁটলা অমনি চুপ ! বড়চৌধুরী কি সহজে ছাড়েন ? এক ধমক দিলেন, 'চোপ্ মিথ্যাবাদী, তুই যদি বাঘ সেজে না এসে থাকবি, তো পোঁটলা বাঁধা ওটা কে শুনি ?'

ঘটু বহুরূপী ল্যাগব্যাগ করে ভিজে রকের ওপর বসে পড়ে বললো, 'ও বাবাগো, কোথায় যাবো ! সন্ধ্যের রেডিওতে শোনেননি বুঝি, চিড়িয়াখানা থেকে বাঘ পালিয়েছে ! ও কী ! এঁয়ারা চল্লেন কোথায় ?'

বাস্তবিকই নিমেষের মধ্যে বাড়ির লোকরা ছাড়া সবাই হাওয়া, দরজায় হুমদাম, গলি শুনশান !

বড়জ্যাঠা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'দিদি সত্যি সত্যি বাঘ বেঁধে ফেললো আর এদের সাহস ছ্যাখ, মণ্টু, যা ডাক্তারখানা থেকে চিড়িয়াখানায় ফোন করে দে।'

আরো কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে খাঁচাওয়ালা ভ্যান নিয়ে বাঘ-ধরুয়ারা এসে পোঁটলা খুলে তাদের বাঘ নিয়ে গেলো। মুগুরের বাড়ি খেয়ে তখনো বাঘের চোখ ঢুলুঢুলু। বড়পিসি খুব রাগমাগ করতে লাগলেন, 'তোমাদের বাঘ বেঁধে রাখতে পারো না বাছা ? এই ছ্যাখো, আমার কটকী বিছানা-ঢাকাটাকে নখ দিয়ে কী-রকম ছিঁড়ে দিয়েছে। এখন কে তার ক্ষতিপূরণ দেবে, শুনি ?'

তাতে ওরা অবাক। 'কেন রেডিওতে তো বলা হয়েছে যে, যে বাঘ ধরে দেবে, সে পাঁচশো টাকা পাবে।' শুনে সকলে মহাখুশী। ভ্যান-এর শব্দ আর বাঘ-ধরুয়াদের চ্যাঁচামেচি পাড়ার লোকদেরও কানে গেছিলো। এখন তারা সব যে-যার ভালোমানুষের মত বেরিয়ে এলো, যেন কিছুই হয়নি।

বড়জ্যাঠা বললেন, 'ঘটু, আজ বড় আনন্দের দিন। একজন বাড়তি লোকের খাবার আছে, তোমার যদি জ্বর না হতো, তাহলে তোমাকেই খিচুরি মাংস খেয়ে যেতে বলতাম।'

ঘটু তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে, উঠোনের কলে হাত ধুয়ে এসে বললো, 'বাঘের ভয়ে আমার জ্বর কখন ছেড়ে গেছে, স্যার!'

———

আরেকটি আষাঢ়ে গল্প

আজকাল নাকি স্থানাভাবে কলকাতা শহরে বারো-চোদ্দ তলা বাড়ি উঠছে; একদিন যখন সব হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে তখন ঠেলাখানা বোঝা যাবে। বাস্তবিকই যদি জায়গা-জমির অত অভাব হত, তাহলে নকুড়বাবুদের বাড়ির পাশেই, দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিলে ঘেরা দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়িটাকে, তার চার বিঘে বনজঙ্গলে ভরা বাগান নিয়ে আজ তিন পুরুষ ধরে লোকচক্ষুর অগোচরে অমন পড়ে থাকতে হত না।

এককালে যে অনেক খরচ করে ওবাড়ি তৈরী হয়েছিল, তার প্রমাণস্বরূপ এতকালের অব্যবহারেও দরজা-জানালা এঁটে বন্ধ, কোথাও কিছু খসে-ধ্বসে পড়ে নি। সদর রাস্তার ওপরে দশফুট উঁচু ফটকের প্রকাণ্ড লোহার কড়ায়, কোন কালের কোন হাকিমের হুকুমে যে বিরাট লোহার তালা লাগানো হয়েছিল, তাতে মরচে ধরলেও ভাঙেনি।

লোকে বলত ভূতের বাড়ি ; ভুলেও কেউ ভেতরে যাবার চেষ্টা করত না। নকুড়বাবু তার এটর্নি শ্বশুরের কাছে শুনেছিলেন, তিন-পুরুষ ধরে বাড়ি নিয়ে মামলা চলে, অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে থেমে আছে, আসল ওয়ারিশরা নিখোঁজ। সন্ধ্যামণির মামাবাড়ির সঙ্গে ওদের নিকট সম্পর্ক ছিল, এমন কি সন্ধ্যামণির মার দিদিমার বিয়ে হয়েছিল ঐ বাড়িতেই। তখন বর্ষাকাল, গাঁয়ের বাড়ির চারধারে জল, নৌকা চেপে যাওয়া-আসা করতে হত। ঐ বিয়ের পর আর কেউ বড় একটা ও-বাড়িতে বাস করেছে বলে শোনা যায় নি। বাড়ির মালিকানা নিয়ে সেই ইস্তক ঝগড়া-ঝাটি, মামলা-মোকদ্দমা চলেছে। এবাড়ির তিনতলার এই ঘরটিকে নকুড়বাবুর পড়ার ঘর, কাজের ঘর, গোঁসাঘর, অস্থায়ী শোবার ঘর ও বিপদের আশ্রয়ও বলা চলে। সন্ধ্যামণি বড় একটা এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে চায় না। চারদিকে জানলা, ফুরফুর করে হাওয়া দেয়, পাখার অভাব বিশেষ টের পাওয়া যায় না। জানলার মাঝে মাঝে প্রায় ছাদ অবধি উঁচু কালো কাঁঠালকাঠের আলমারি, কানায় কানায় নথিপত্র ফাইল আর আইনের বই ইত্যাদি দিয়ে ঠাসা। তাকালেও দম বন্ধ হয়ে আসে ; কিন্তু ঘরটি নিরিবিলি ; সোজা একতলার হলঘর থেকে উঠে আসা যায় মক্কেলরা তাই আসেও। মুস্কিল হল, দোতলার বড় ঘরে সিঁড়ির দিকে মুখকরে, সন্ধ্যামণির চররা দিনরাত বসে থাকে আর কেউ ওপরে গেল না গেল রিপোর্ট করে, বন্ধুবান্ধবদের এখানে আনা যায় না।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, পাশের বাড়ির দোতলার বন্ধ খড়খড়ির ফাঁকে আলো দেখতে পেয়ে নকুড়বাবু একটু বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। মনে পড়ল ছেলে-মেয়েরা ছোটবেলায় মাঝে মাঝে বলত বটে, পাশের বাড়িতে ভূতেরা আলো জ্বালে, তবে ওদের কথায় কেউ বড় একটা কান দিত না, সন্ধ্যামণি ওসব কুসংস্কার পছন্দ করে না। আজ দেখা গেল শুধু আলোই নয়, মাঝে মাঝে একটা ছায়াও যেন নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। আলোটা কমছে, বাড়ছে, কাঁপছে, মোমবাতিই হবে বোধ হয়।

ছোট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে, নকুড়বাবু ভাবলেন, রোমাঞ্চ হয় তো এইখানেই হাতের গোড়াতেই রয়েছে, অথচ সেখানে তাকে খোঁজা দূরের কথা, হলুদ মলাটের রোমাঞ্চ সিরিজের বইগুলোকে পর্যন্ত নথিপত্রের মধ্যে চাপা দিয়ে লুকিয়ে বাড়িতে এনে, খবরের কাগজের মলাট দিয়ে ঢেকে তিনতলার বই পড়ার ঘরের শক্ত কাঠের চেয়ারে বসে, গভীর রাতে দুরুদুরু বক্ষে পড়তে হয়। অথচ এ কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই সামান্য ভীতি বিহ্বলতার মধ্যেও যেটুকু রোমাঞ্চের আস্বাদ আছে, নকুড়বাবু তারও শেষ কণাটুকু উপভোগ করেন। অবিশ্যি এর বিন্দুবিসর্গও যদি সন্ধ্যামণি জানতে পারে, তাহলে যে নকুড়বাবুর তিনতলার এই নিঃসঙ্গ স্বর্গবাসটুকু ঘুচে যাবে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। উঠতি এটর্নিদের যে এসব বিলাসব্যসন থাকতে নেই, সন্ধ্যামণির মুখে সে কথা নকুড়বাবু কম করে লক্ষবার শুনেছেন।

উঠতি এটর্নি হলেও নকুড় কোলের বয়সটা নিতান্ত কম নয়, তবে সন্ধ্যামণি বলে, আটচল্লিশ নাকি এটর্নিদের উঠতি বয়স ; তার আগে পসার জমলেও, সেটা অস্বাভাবিক এবং অস্থায়ী। এসব বিষয়ে সন্ধ্যামণি খুব ওয়াকিবহাল, কারণ শুধু যে পসারটি আসলে তার বাবার তৈরী এবং নকুড়বাবু বিলম্বিত যৌতুক স্বরূপ পেয়েছেন তাই নয়, উপরন্তু সন্ধ্যামণি প্রাইভেটে বি-এ পাশ করেছে, এ কথা ভোলা যায়ও না, সন্ধ্যামণি ভুলতে দেয়ও না। সুতরাং এ বাড়িতে সব কিছু তার হুকুমে চলে ; বলা বাহুল্য বাড়িটিও সন্ধ্যামণির বাবার কাছ থেকে পাওয়া।

কে যেন ফুঁ দিয়ে পাশের বাড়ির বন্ধ ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিল।

তবু নকুড়বাবু রুদ্ধশ্বাসে সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন এবং তার পুরস্কারও পেলেন। ক্যাঁচ করে পাশের বাড়ির একতলার পেছন দিককার একটা দরজা দিয়ে ছায়ামূর্তি খুব সাবধানে বেরিয়ে এসে, বাইরে থেকে দরজায় তালা দিল। তারপর বাগানের বুনো-গাছের

ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে, মনে হল যেন বাড়ির সামনের দিকে চলে গেল। নিশ্চয় কোনো আইন ভঙ্গকারী, হয়তো ওর নামে বডি ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে, প্রকাশ্যভাবে লোক সমাজে বেরুলেই ওকে ধরে নেবে। দেয়াল-আলমারিতে রাখা সারি সারি আইনের গ্রন্থের, পুরোনো কেসের ফাইলের আর রোমাঞ্চ সিরিজের কাছে নকুড়বাবুর ঋণ অপরিশোধ্য, একথা তিনি একশোবার স্বীকার করবেন।

সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ শুনেই জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নকুড়বাবু টেবিলে স্তুপাকার করা দলিলগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, দলিলের নিচে রোমাঞ্চ সিরিজ নিরাপদে অদৃশ্য হয়ে রইল। সন্ধ্যামণি ঘরে ঢুকে খালি তক্তাপোষে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল আর ঘরময় উগ্র জর্দার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। নকুড়বাবু ভয়ে ভয়ে একবার চোখ তুলতেই সে বললে—'অবিনাশবাবুর' দোকান থেকে দুটো নতুন ছিপ এসেছিল, ফিরিয়ে দিয়েছি।

নকুড়বাবু দলিলে মন দিলেন। কপালের দুপাশের দুটো শিরা প্রকাশ্যভাবে দপদপ করতে লাগল।

সন্ধ্যামণি আবার বললে 'অন্য ছিপটা কার জন্যে ?'

নকুড়বাবু মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন, সন্ধ্যামণির কাছে বিষ্টুদার নাম পর্যন্ত করা যায় না। বলতে হলনা কিছুই, সন্ধ্যামণি নিজেই অবার বললে—'কার জন্যে তাও আমার জানা আছে। ঐ নিষ্কম্মার ধাড়ি বিষ্টু বাড়ুজ্জে ছাড়া আবার কার জন্যে। তাকেও ভাগিয়েছি। কি যেন শনিবারের বিষয় বলতে এসেছিল, দিইছি হাঁকিয়ে। চুল আঁচড়ায় না, দাড়ি কামায় না, কাপড় কাচে না। ছিঃ।'

নকুড়বাবু এমনি চমকে উঠলেন যে, তিনখানি দলিল একসঙ্গে টেবিল থেকে পিছনে নিচে পড়ে যাওয়াতে, হলদে মলাটের ওপর লাল হরফে লেখা 'রক্তের নিশানা'—রোমাঞ্চ সিরিজ খ (১৬) সন্ধ্যামণির চোখের সামনে অবারিত হল।

নকুড়বাবু সেটা লক্ষ্য না করেই বললেন—'ইয়ে মানে তাকে কোন কটু কথা বলনি তো ? ওর মনটা বড্ড নরম কিনা'—আরো কিছু

বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যামণি বাধা দিয়ে বললে—'কটু কথা বলব কেন, তাকে বলে দিয়েছি শনিবার দুপুরে তোমার অন্য কাজ আছে।'

নকুড়বাবু বললেন—'কি কাজ, ছুটির দিনেও মাছ ধরব না তো ধরব কখন?'

'মাছ ধরতে হবেনা। আমার বাবার নাম ভেঙে যে করে খাচ্ছ, তিনি কবে মাছ ধরেছেন শুনি? যারা পয়সা কড়ি রোজগার করে তারা কখন মাছ ধরে? টাকা ফেললেই তাদের ঘরে পাঁচ দশ কিলো কাটা পোনা এসে উপস্থিত হয়।'

নকুড়বাবু তবু বললেন—'কিন্তু তাকে যে কথা দিয়েছিলাম—'

কথা বন্ধ হয়ে গেল, হঠাৎ চোখ পড়ল পায়ের কাছে মাটির ওপরে ছোট্ট একটা সোনালি চাবি চকচক করছে। বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল, পা দিয়ে চাবিটাকে চেপে রাখলেন। এদিকে সন্ধ্যামণি বলেই চলেছে—'রাখো তোমার কথা, তাকে এমনি কড়া কড়া কথা শুনিয়েছি যে আমি থাকতে আর সে এমুখো হবে বলে মনে হয় না। কাল তুমি কোর্ট ছুটির পর আমাকে বোনের বাড়ি নিয়ে যাবে। তার মেয়ে নাকি কোথাকার এক তিনশো টাকার মাইনের ডাক্তারের সঙ্গে নিজের বিয়ে ঠিক করেছে, সে-সব বন্ধ করতে হবে।'

সন্ধ্যামণি দুমদুম করে নিচে চলে গেল, চোখ বন্ধ করে নকুড়বাবু মনে মনে বলতে লাগলেন 'হে ভগবান, ও যদি সত্যিই না থাকত কি ভালোটাই যে হত।' তারপর নিজের চিন্তাতে নিজেই আঁতকে উঠে, জিভ কেটে বললেন—"তাই বলে ও মরে যাক তা বলছিনা, ভগবান, তার আবার মেলা ফ্যাসাদ, কিন্তু যদি না-ই জন্মাত, তাহলে আমি, আমি কি সুখীই না হতাম।'

চোখের সামনে ভেসে উঠল বিষ্টুদার ঠাকুর্দার আমলের পুরানো পুকুরের পারে প্রকাণ্ড কাঁঠালগাছের ছায়াতে, ঘাটের ভাঙ্গা সিঁড়ির পাশাপাশি বসে বিষ্টুদা আর উনি। কেউ কোনো কথা বলছেন না, পাশে বিস্কুটের টিনের মধ্যে কেঁচো কিলবিল করছে, পিঁপড়ের ডিম গাদা হয়ে আছে, মুখ বন্ধ কৌটতে মাছ ধরার মশলা, তার একটুখানি

গন্ধও যেন নকুড়বাবুর নাকে এল। নাঃ এর একটা ব্যবস্থা না করলেই নয় অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে আবার জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির বাগানের দিকে চোখ গেল। ছায়ামূর্তিটা এগাছের নিচে সে গাছের নিচে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা সন্ধ্যামণি যদি না-ই জন্মাত কি এমন ক্ষতিটা হত—আচ্ছা, সেই অদ্ভুত চাবিটা কোথায় গেল। মাটি থেকে সেটিকে তুলে অন্যমনস্কভাবে নকুড়বাবু পকেটে ভরলেন।

সে শনিবারটা সত্যিই মাঠে মারা গেল। বোনের বাড়ি গিয়ে সন্ধ্যামণি মহা হৈ-চৈ করে এল, তিনশোটাকার মাইনের ডাক্তারকে ডেকে এনে যা-নয়-তাই বলে আপমান করা হল, মিনু কেঁদে কেঁদে সারা। একবার তাকে একটু একা পেয়েই নকুড়বাবু বলে বসলেন—'ছাখ, ওদের কথা শুনিস নে, এখন চুপ করে থাক, আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করব, দেখিস।' কি ব্যবস্থা যে করবেন তা অবিশ্যি নিজেই জানেন না।

এই নিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে সন্ধ্যামণির সঙ্গে একটু রাগমাগ হল, অর্থাৎ সন্ধ্যামণিও খুব খানিকটা রাগমাগ করল, নকুড়বাবু বোবা হয়ে রইলেন, তার কোন প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত দিলেন না। পরদিন সকালে সন্ধ্যামণি স্যুটকেশ গুছিয়ে গোঁসা করে মাসির বাড়ি গেল। বাপের বড়ি যাবার উপায় নেই, কারন বাপ-মা বহুদিন গত হয়েছেন, ভাজের সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায়।

সন্ধ্যামণি বাড়ি ছাড়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যে নকুড়বাবু বিষ্টুদের বাড়ি গিয়ে তাঁকে টেনে বের করে এনে নিউ স্পোর্টস থেকে সেই ছিপ ছুটি নগদ টাকা দিয়ে উদ্ধার করে কালীকেবিন থেকে ঝুড়ি বোঝাই পরটা, সামিকাবাব, বিরিয়ানি, আর মটন কোর্মা কিনে মুটের মাথায় চাপিয়ে নিজে প্রকাণ্ড ওয়াটার বটল কাঁদে ঝুলিয়ে, বিষ্টুদার ঠাকুরদার পুকুরের ধারে সারাদিন কাটিয়ে দিলেন। বাড়ির লোকে জানল চুঁচড়োর বড় মক্কেলের বাড়ি গেছেন। বাড়ির লোক বলতে সন্ধ্যামণির বুড়ি পিসি, তাঁর বিধবা পুত্রবধূ, সন্ধ্যামণির সই আর তার

বেকার স্বামী এবং তিনটি বংশধর। নকুড়বাবুর মেয়ের কোন্‌কালে খুব ভাল বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে খড়্গপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। বলা বাহুল্য ঠাকুর, চাকর, ঝি, জমাদার এরাও সন্ধ্যামণির স্পাই।

সন্ধ্যাবেলায় জলের বোতল, খাবারের ঝুড়ি ও মাছ ধরার সরঞ্জাম বিষ্টুদার বাড়িতে জমা দিয়ে মনের খুশিতে তিন-তিনটে রোমাঞ্চ সিরিজ কিনে, দোকানদারকে দিয়ে অভ্যাসমতো খবরের কাগজের মলাট লাগিয়ে, নকুড়বাবু বাড়ির পথ ধরলেন। মোড়ের মাথায় পৌঁছে, নিজেদের আধা-অন্ধকার গলিতে ঢুকতে যাচ্ছেন, এমন সময় লক্ষ্য করলেন দশ গজ সামনে আপাদমস্তক কালো কাপড়-চোপড় পরা একটা মূর্তি হন হনিয়ে এগিয়ে চলেছে। কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হলেও প্রথমটা হঠাৎ নকুড়বাবু ঠাওর করতে পারেননি লোকটা কে। কিন্তু যেই সে পাশের বাড়ির বিশাল তালা ঝোলানো দশ ফুট উঁচু ফটকের সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, পকেট থেকে লম্বা একটা চাবি বের করে ফটকের গায়ের ছোট কাটা দরজাটি খুলে ফেলল, তখন আর তাকে চিনতে বাকি রইল না।

তারপরেই যা ঘটল, সে এমনি অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক যে, নকুড়বাবুর যেন বুদ্ধি লোপ পেল। হঠাৎ ফোঁস করে ফটকের নীচেকার আগাছার মধ্যে থেকে যেই না একটা সাপ ফনা তুলেছে, এক রকম নিজেরি অজান্তে নকুড়বাবু তাঁর লোহা বাঁধানো লাঠির এক বাড়িতে তার মাজা ভেঙ্গে দিয়েছেন। লোকটার হাতে একটা ছোট সস্তা দু'সেলের টর্চ, তারি আলোতে দেখা গেল, মরা সাপটার শরীরের পাকে পাকে তখনো ঢেউ খেলছে। দেখে লোকটা শিউরে উঠল।

তার হাতদুটো থরথর করে কাঁপছে, টর্চের আলোটাও লগবগা করেছে, অন্ধকারে তার মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, ঠাণ্ডা একট হাত দিয়ে নকুড়বাবুর হাত চেপে ধরে ভাঙা খনখনে গলায় সে বললে —'আসুন, ভিতরে আসুন, আজ আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।'

এরকম একটা খেমো চেহারার লোকের মুখে এমন শুদ্ধ ভাষা শুনে নকুড়বাবু বেশি অবাক হলেন না, কারণ রোমাঞ্চ সিরিজে এর চেয়েও অনেক বেশী অপ্রত্যাশিত ঘটনা হামেশাই ঘটে থকে।

আনন্দে উত্তেজনায় অধীর হয়ে লোকটার পিছন পিছন কাটা দরজা দিয়ে তিনি ভূতের বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলেন। সে খুব সাবধানে দরজাটিকে আবার ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে, একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল—নিজেই চাবিটি করে নিয়েছি ; আমার নাম অর্দ্ধেন্দু পাকড়াশী। আসুন আমার সঙ্গে।

(দুই) কালের কল

আঃ! কি আনন্দ, কতদিনের কৌতুহল এবার চরিতার্থ হতে চলেছে, তিনপুরুষ বাদে আবার এই প্রথম ভূতের বাড়িতে মানুষের পা পড়ল, অবিশ্যি কালো পোষাক পরা লোকটাকে না ধরলে—বাগান তো নয়, সোঁদর বন ; এককালে বাড়ির চারদিকে পাথর দিয়ে বাঁধানো দশ ফুট চওড়া পথ ছিল, এখন তার ফাটলে ফাটলে ঘাস, আগাছা, বাড়ন্ত অশ্বথ গাছ। বাড়ির পিছন দিকের দরজাটি নিঃশব্দে খুলে অর্দ্ধেন্দু বলল—'আমার সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, এমন কি প্রাণটা পর্যন্ত আপনার হাতে তুলে দিলাম ; উপকারীকে আমি নমস্য দেবতা মনে করি।' এই বলে হঠাৎ ঢিপ করে নকুড়বাবুর ময়লা পামসুতে কপাল ঠেকিয়ে, দরজা ঠেলে ঘুট ঘুটে অন্ধকারের ভিতরে ঢুকে গেল।

ক্ষীণ টর্চ জ্বেলে সে বললে,—'নির্ভয়ে চলে আসুন, এ সবই আমার বহুকালের জানো, কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।' আসবাবে বোঝাই ধূলোয় ধূসর হলঘরটিকে সাবধানে পেরিয়ে ওর পিছন পিছন নকুড়বাবু শ্বেত-পাথরের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন। সিঁড়ির মাথায় একটা খালি সিগারেটের টিনে মোমবাতি গোঁজা। পকেট থেকে দেশলাই বের করে সেটি জ্বেলে, পথ দেখিয়ে নকুড়বাবুকে একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে, মহা খাতির করে অর্ধেন্দু খালি তক্তাপোষে বসতে দিল। তারপর নিজেও তাঁর পাসে বসে বলল—'আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন ?'

নকুড়বাবু এমনি আঁৎকে উঠলেন যে, জিভ কামড়ে গেল। একটু সামলে বললেন—"না-মানে, না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করি না।"

লোকটি হাসল, সে যে কি বিশ্রী শুকনো খটখটে হাসি, না শুনলে কল্পনা করা যায় না। নকুড়বাবু জিব দিয়ে একবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। লোকটি তাই দেখে নরম গলায় বললে—'না, না, লজ্জা পাবার কিছু নেই; আমি তিনকাল ঘুরে দেখেছি ভূতফুত কিছু নেই। হ্যাঁ, তবে সেকালের লোক, যাঁরা কোন্‌কালে পঞ্চত্ব পেয়েছেন, তাঁদের যে মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে দেখা যায় না,—একথা বলছি না।'

নকুড়বাবু ক্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, থুতনিটা দেড় ইঞ্চি ঝুলে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে লোকটার কাছ থেকে একটু সরে বসতেই, সেও অমনি কাছে ঘেঁসে এসে বলল—'কোন ভয় নেই, বলেছি তো ভূতফুত কিচ্ছু নেই। এক্কেবারে পঞ্চত্ব পেলে আর তার দেখা দেবার উপায় থাকে না। যা করবার বেঁচে থাকতেই করতে হয়।

নকুড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'তবে যে এইমাত্র বললেন, পঞ্চত্ব পাওয়াদেরো মাঝে মাঝে দেখা যায়!'

লোকটা উঠে দাঁড়াল—'কি মুস্কিল, জ্যান্ত অবস্থাতেই অনেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভবিষ্যত ঘুরে আসতে পারেন তো, তখন ভবিষ্যতের লোকরা তাদের দেখতে পেয়ে ভূত ভাববে না তো কি ভাববে? কিন্তু আসলে তাঁদের সময়ে তাঁরা বেঁচেই আছেন—'

এই অবধি বলে, নকুড়বাবুকে মাথা চুলকোতে দেখে অর্ধেন্দু বিরক্ত হয়ে বলল—'কি? বিশ্বাস হল না বুঝি! দেখুন, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আমার নমস্য দেবতা—স্বরূপ আপনি, কিন্তু বুদ্ধিটা যে খুব প্রখর তা তো মনে হচ্ছে না।—তবে এই দেখুন।'

এই বলে লোকটা তার কালো গলাবন্ধ কোটের আস্তিন একটু গুটিয়ে নিল। নকুড়বাবু দেখলেন তার কব্জিতে একটা অদ্ভুত হাতঘড়ি, একগোছা সরু সরু তারের ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা। অবাক হয়ে বললেন কি এটা?'

'দেখুন না, অত ভয় কিসের, খুলে ভালো করেই দেখুন না। অদ্ভুত বটে ঘড়িটা, মুখটা অনেকটা টেলিফোনের ডায়ালের মতো, ঐ রকম ০ থেকে ৯ সংখ্যা গোল করে সাজানো, ঐ রকম একটা কাঁটা লাগানো ডায়ালটাকে ঐ রকম করেই ঘোরানোও যায়।'

অর্ধেন্দুর দিকে নকুড়বাবু এবার ভালো করে তাকালেন। ভারি নিরীহ চেহারা, সামনে পিছনে সমান ছোট করে কাঁচা-পাকা চুল ছাঁটা, মুখময় সাতদিনের কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়ি, কানটা একটু লম্বা, লতিটা গালের সঙ্গে জোড়া। সেদিকে চোখ পড়তেই লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে—'আমাদের বংশের সব ছেলেমেয়েদেরই এই রকম কানের লতি জোড়া আর পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে হাঁসের পায়ের মতো পাতলা চামড়া লাগানো।' এই বলে, বকলস্ লাগানো ময়লা জুতোর মধ্যে থেকে একটা পা বের করে, আঙ্গুল ফাঁক করে দেখলে।

নকুড়বাবু ঘড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ডায়ালের ধার দিয়ে বারোমাসের নাম আর ১ থেকে ৩১ সংখ্যাও লেখা রয়েছে লক্ষ্য করলেন। অর্ধেন্দু পাকড়াশী বললে—'নিশ্চয় এতক্ষণে টের পেয়েছেন যে, আমি একজন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক ; এইচ-জি ওয়েলসের টাইম মেশিন নিয়ে আপনারা এত নাচলেন, ছবি করলেন, অথচ সেটা একটা বেধড়কা বড়, অতি আনাড়ি ব্যাপার ; কোথাও নিয়ে গেলে, নিরাপদ জায়গায় রাখাই এক মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, অমনি ভিড় দাঁড়িয়ে যায়, প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ঘেমে নেয়ে উঠতে হয়। জটিল সব যন্ত্রপাতির একটা কলকব্জা বিগড়োলেই তো হয়ে গেল, থাকুন পড়ে পঞ্চাশ শো সালে। এই অনেকটা আমার যেমন হয়েছে, যদিও এ ঘড়িটার ব্যাপার অনেক সাধাসিধা। দুঃখেরবিষয় চাবিটা কোথায় পড়ে গেছে।'

নিঃশ্বাস বন্ধ করে নকুড়বাবু ওর কথা শুনেছিলেন, দারুন উত্তেজনায় ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস পড়ছিল। চাপাগলায় বললেন—'চাবির ব্যবস্থা হলে তবে কি এই ঘড়িটার সাহায্যে অতীতে কিম্বা ভবিষ্যতে যেখানে খুশি যাওয়া যাবে?'

অর্ধেন্দু বিরক্ত হয়ে উঠল—'যেখানে খুশি আবার কি ? এটা কি একটা বাইসিকল যে যেখানে খুশি যাবেন। যখন খুশি বলুন। ঐ ১ থেকে ৯ অবধি যতগুলি সংখ্যা আছে আর তার সঙ্গে ০ জুড়লে, কোন রাশিটা না হয় বলুন। অর্থাৎ কোন সময়ে না যাওয়া যায় বলুন ? দেখতে পারেন বৃত্তের ধারে এ-ডি ও বি-সি দুই-ই চিহ্ন করা আছে, ঐ ছোট্ট কাঁটাটা যেখানে দরকার সরিয়ে নেবেন, তারপর ব্যস, মাস তারিখ ঠিক করে নিয়ে, টেলিফোনের মতো ডায়াল ঘোরাবেন। —এখন ঐ চাবিটা নিয়েই যত ভাবনা। ওটি দিয়ে দম না দিলে, কালের কল এক সেকেণ্ডও চলবে না।'

নকুড়বাবুর বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠল, কাষ্ঠ হেসে বললেন—'চাবিটা যদি খুঁজে দিই, আমাকে ঘড়িটা একবার একটু পরতে দেবেন ?' তিন হাত লাফিয়ে উঠল অর্ধেন্দু।—'না, না, না, সে কাজ নেই, শেষটা কি হতে কি হয়ে যাবে। আপনি বরং এবার বাড়ি যান, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ঘড়ির কথা ভূলে যান।'

নকুড়বাবু তখনই উঠে পড়ে বললেন—'থাক তবে চাবিটা।'

অর্ধেন্দুর চেহারাই বদলে গেল, একগাল হেসে নকুড়বাবুর হাত চেপে ধরে বলল—'না, না, তাই বললাম কি ? মিছিমিছি বিরক্ত হচ্ছেন। এর অনেক বিপদ, অনেক ঝামেলা, তার থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যেই—শেষটা না জেনে-শুনে'—

নকুড়বাবু বাধা দিয়ে বললেন—'না জেনে-শুনে আবার কি ? জানেন আমি ল, পরীক্ষায় জলপানি পেয়েছিলাম—না জেনে-শুনে কেউ পায়। তারপর সাড়ে তিন শোর বেশি রোমাঞ্চ সিরিজ পড়েছি।'

অর্ধেন্দু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—'চাবিটার জন্যে আমি সব দিতে পারি। এই দেখুন আরেকটা ঘড়ির সব তৈরী, কিন্তু ঐ চবিটার ছাপ না পেলে আরেকটা চাবি হবে না। এই বলে গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে একমুঠো ছোট্ট ছোট্ট কলকব্জা স্ফটিকের টুকরো ইত্যাদি বের করে দেখাল। তারপর আবার বলল—'সব দিতে পারি, বুঝলেন,

আমার যা আছে সব। কই চাবিটা ?'

নকুড়বাবু পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করলেন। তার সবচেয়ে ছোট খাপ থেকে চাবিটাকে বের করে অর্ধেন্দুর হাতে দিয়ে বললেন—নিন আপনার চাবি, বড় পয়মন্ত জিনিস। পেতে না পেতে যে সুযোগ কেউ পায় না, তাও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছে। এবার বলুন কবে ঘড়ি পরতে দেবেন ? কাল রাতের মধ্যে না হলেই নয়, তারপর আর আমার সে রকম সুবিধে হবে না বোধ হয়।'

অর্ধেন্দু অন্যমনস্ক ভাবে বলল—'বেশ তাই দেব। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনাকে অদেয় আমার কিছু নেই।'

নকুড়বাবু উঠে বললেন—'তাছাড়া চাবিও খুঁজে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, কোথায় পেলেন ওটাকে ?'

পাশের বাড়ির তিন তলায়, আমার পড়ার ঘরে। এইটাই আমার আশ্চর্য লাগছে।'

'আশ্চর্যের কিছুই নেই। কালান্তরে যেতে গেলে ছোট্ট একটা জিনিস একটু ইদিক ওদিক ছিটকে খুবই পড়তে পারে। সে থাক গে, আপনি নিশ্চন্ত হয়ে বাড়ি যান। আমি আজ রাত্রেই নতুন চাবিটা করে ফেলব, কালকেই ঘড়ি পরতে পারবেন। আচ্ছা নমস্কার। আমার টর্চটা দিয়ে পথ দেখে যাবেন, কাল ফিরিয়ে দিলেই হবে। অনেক কষ্টে এটি যোগাড় করতে হয়েছে।'

অর্ধেন্দু পাকড়াশী যেন তাঁকে বিদেয় করতে পারলেই বাঁচে! নকুড়বাবু সহজে নড়েন না, এতকাল বাদে অন্ধকারের মধ্যে একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখছেন, অমনি অমনি চলে গেলেই হল কি না।

অর্ধেন্দু উঠে দরজার দিকে এগিয়ে বলল—'কই, উঠুন।'

নকুড়বাবু বললেন—'মানে ইয়ে ঘড়ির সাহায্যে যে কোনো কালে গিয়ে কি ছায়ার মতো শুধু দেখা দেব, নাকি কথা বলতে, কাজ করতে পারব ?'

অর্ধেন্দু হাসল—'বিলক্ষণ পারবেন। কেন পারবেন না, সুস্থ জ্যান্ত মানুষ তো আপনি ? খুব আদিম কালে না গেলে ভাষা-টাষারো

কোনো অসুবিধা হবে না, তবে একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন, টাইম মেশিনে অন্য কালেই শুধু যাওয়া যায়, অন্য যায়গায় নয়। যেখানে দাঁড়িয়ে কল ঘোরাবেন, ঠিক সেখানেই থেকে যাবেন, খালি সময়টা পাল্টে যাবে। যদি অন্য জায়গায় যেতে চান, সেকালের যানবাহনের ওপর নির্ভর না করে, ট্রেনে কিম্বা মটরে কিম্বা উড়োজাহাজে সেখানে গিয়ে তবে ডায়াল করাই ভালো।

নকুড়বাবু অধৈর্য হয়ে বললেন—না, না, অন্য কোথাও আমি যেকে চাই নে, এতেই আমার হবে।

অর্ধেন্দু একটু হাসল। 'এখানেও যে বড্ড নিরাপদ, তা ভাববেন না। বাপ, একদিন অন্যমনস্ক হয়ে বড্ড বেশি আগে চলে গেছলাম, তারপর এক অতিকায় শুঁয়োপোকার তাড়া খেয়ে পালিয়ে পথ পায় নে। এ জায়গাটাও সেকালে খুব নির্ভয় ছিল না।'

নকুড়বাবু শুধু বললেন—'অত আগে যাব না।'

বাড়ি ফেরার পথে কথাটা ভেবে হাসি পেল। অত আগে যাবার দরকারটা কি? সন্ধ্যামণি যাতে না জন্মায় তার ব্যবস্থা করলেই তো হল। তার বাবামার বিয়েটি ঘটতে না দিলেই তো কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল। কিন্তু মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করতে থাকে, বড্ড কানের কাছ ঘেঁষে যাওয়া হচ্ছে নাকি? তা ছাড়া ওঁদের বিয়ে হয়েছিল বোম্বাই শহরে, সেখানে এখন যাবার কোন সুবিধেই হবে না। অবিশ্যি সন্ধ্যামণির দিদিমার বিয়েতে বাগড়া দিলেও চলে; কিন্তু তাদের বিয়ে হয়েছিল নাকি গুরুদেবের আশ্রমে, লছমন ঝোলায়। তার চেয়ে সন্ধ্যামণির মায়ের দিদিমার বিয়েটি পণ্ড করে দিলেই তো ভাল হয়; কোথাও যেতেও হবে না, ঐ পাশের বাড়িতেই বিয়ে হয়েছিল, কোনো অসুবিধে নেই। তা ছাড়া এতে আরো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, একগাদা হোপলেস্ ইডিয়ট আর স্কাউণ্ড্রেল তা হলে জন্মায় না।

এতকাল ধরে এত কেস্ দেখলেন, শুনলেন, পড়লেন, ঘাঁটলেন নকুড়বাবু আর এই সামান্য কাজটুকু পারবেন না? কেন, গত বছর দু'হাজার টাকা ফি নিয়ে, চোখের সামনে অভয় ঘোষ শ্রীরামপুরের

অতকালের ঐ পুরোনো বিয়েটা পর্যন্ত ভেঙ্গে দিতে পারল, তার তুলনায় এটা আর এমন কি! কোনো অসুবিধেই নেই। ওঁদের বংশ পরিচয় আছে সন্ধ্যামণির দেরাজে, তাতে বুড়োবুড়ির বিয়ের সন তারিখ দেওয়া আছে। রাতে শুয়ে শুয়ে প্ল্যানটাকে আরো পাকিয়ে নেওয়া গেল। একটা বিয়ে ভাঙ্গা কিছু শক্ত কাজ নয়। কেন, ছোট কাকার বিয়ে তো একটা বেড়াল না, কুকুর না কিসে যেন ভেঙ্গে দিয়েছিল। সঠিক জানেন না নকুড়বাবু, কিন্তু জানোয়ারটা হঠাৎ খেপে উঠে বর কর্তাকে তাড়িয়ে স্টেশন পার করে দিয়েছিল। সুযোগ বুঝে বরও চোঁ-চোঁ দৌড়, একেবারে বিলেত পর্যন্ত। মেয়ের বিয়ে হল পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে। নিন্দুকরা অবিশ্যি বললেন যে, সমস্ত ব্যাপারটাই ঐ ছেলেরই সাজানো। সে যাই হোক গে, বিয়ে ঠিক করার চেয়ে যে বিয়ে ভাঙ্গা অনেক সহজ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বিশেষ করে সেকালের বিয়ে। মেয়ে সম্পর্কে বর পক্ষের কানে মনগড়া একটা কানাঘুযো তুলে দিলেই হল, শুধু ঐ মেয়ে কেন, ওর বোনদের বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত দায় হয়ে উঠবে। কিন্তু মেয়েদের অনিষ্ট নকুড়বাবুর দ্বারা হবে না, ওঁর বিবেকে বাধে। হ্যাঁ, তবে সন্ধ্যামণিকে নাই করে দেওয়াটা তো আর ওর অনিষ্ট করা নয়, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বরং ওর উপকারই করা। কারণ উদয়াস্ত সন্ধ্যামণি বলে যে, নকুড়বাবুর সঙ্গে বিয়ে হওয়াতেই নাকি তার কাল হয়েছে; সে যদি না-ই জন্মায়, তা হলে তো আর নকুড়বাবুর স্ত্রী হয়ে তাকে কষ্ট পেতে হবে না। অবিশ্যি তাই বলে নকুড়বাবুকেও কিছু আইবুড়ো থাকতে হবে না, ছেলেমেয়ের সম্ভবত আরো ঢের ভাল মা হবে, অন্তত এর চাইতে মন্দ তো আর হবে না, কারণ সেটা অসম্ভব। তা হলে সন্ধ্যামণির জায়গায় যার নকুড়বাবুর স্ত্রী হবে সে কেমনটি হবে? এই ভেবে নকুড়বাবু ভারি বিস্ময়বোধ করতে লাগলেন যে, যার সঙ্গে কুড়ি বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে, সে কেমন মেয়ে তাই জানেন না।—সে যাই হক গে, সন্ধ্যামণির দিদিমার বিয়ের বরটিকে

যে কোন উপায়ে ভাগাতে হবে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নকুড়বাবু ভাবলেন, ব্যাপারটাতে যে খুবই রোমাঞ্চ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; তাছাড়া কি এমন ক্ষতিটা হতে পারে? একটা হাত ঘড়ির মতো ছোট কালের কল দিয়ে, বিশেষ করে যেটা চাবি দিয়ে চলে, এরকম একটা সেকেলে কল, তাই দিয়ে সে ইতিহাসের ধারা বদলে দেওয়া যেতে পারে এটা নকুড়বাবুর আদৌ বিশ্বাস হয় না। তাই যদি হত, তা হলে অর্ধেন্দু ব্যাটা আর ঝোপে ঝাড়ে হারানো চাবি খুঁজে বেড়াত না, নির্ঘাৎ ঐ সব পুরানো তালি দেওয়া কোট আর আঁটো পেন্টেলুন ছেড়ে একটা বাদশা-কাদশা হয়ে, হীরেমানিক বসানো জাব্বাজোব্বা পরে সোনার মসনদে বসত। এই অবধি ভেবে হঠাৎ নকুড়বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

॥ তিন ॥

ঘুম থেকে যখন উঠলেন নকুড়বাবু অবাক হয়ে দেখলেন, ঘুমের মধ্যেই প্ল্যান্ অফ অ্যাকশনটি কেমন মগজের ভেতর তৈরি হয়ে গেছে। একটা নয়, একেবারে দু-দুটো প্ল্যান, তবে প্রথমটাকে তক্ষুণি সেকালে অচল বলে বাতিল করে দিতে হল। হালে চোগো বাঁড়ুজ্জে মনীষাদেবীর সঙ্গে কানাই চৌধুরীর বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে নিজে তাকে বিয়ে করেছিল, খুব সহজ উপায়ে। বিয়ের দিন সকালে মেয়ের বাপের কানে তুলে দিল যে, ছেলে বিবাহিত. এমন কি নিজের ছোট বোনকে ছেলের আগেকার স্ত্রী সাজিয়ে মনীষাদের বাড়ি পাঠাতে পর্যন্ত পেছপাও হল না। কিন্তু সেকালে এই সামান্য কারণে বিয়ে ভাঙত না। কাজে কাজেই দ্বিতীয় প্ল্যানটাকে কাজে লাগাতে হবে। তাতেও মেয়ের নাম জড়িত থাকলেও তার যে কোনো অনিষ্ট হয় নি, পরবর্তী কালের ঘটনা-প্রবাহ থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

কি করে যে সারা দিনটা কাটিয়ে [illegible] নকুড়বাবু আজও ভেবে পাননি। সোমবার অবিশ্যি এমনি কাজের চাপ থাকে যে, সময় কাটল কি কাটল না, এ বিষয়ে চিন্তা করবারও সময় থাকে না, নকুড়বাবুর সময়কে একটি অদৃশ্য শত্রু বলে মনে হচ্ছে না; বরং সিনেমার ফিল্মের

মতো লাগছে, যাকে ইচ্ছে মতো এক রিল থেকে আরেক রিলে গুটোনো যায়। তফাৎ শুধু এই যে, এ ফিল্মের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

সে যাই হক, এক সময় সত্যি করে সন্ধ্যে হল, নকুড়বাবু নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে পাশের বাড়ির দোতলার সেই ঘর খানিতে অর্ধেন্দুর কাছে উপস্থিত হলেন। অর্ধেন্দু কিন্তু ভারি নার্ভাস।—'দিচ্ছি তো ঘড়িটা আপনাকে বিশ্বাস করে। শেষটা একটা যাচ্ছে তাই ফ্যাসাদ পাকাবেন না তো? আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন সেই জন্যে আমি এবং আমার চৌদ্দ পুরুষ আপনার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব সেই কি যথেষ্ট হত না?'

নকুড়বাবু কর্কশ গলায় বললেন—'না, হত না। কথার খেলাপ করতে চান নাকি, অর্ধেন্দুবাবু?'

অর্ধেন্দু বললে—'আমার আসল নাম অর্ধেন্দু নয়। এই ধরুন ঘড়ি। আমার সততা সম্পর্কে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবে এ আমার অসহ্য। তবু আপনার ভালোর জন্যেই জিজ্ঞাসা করি, কোন সালে যেতে চান? তার জন্যে ভালোভাবে প্রস্তুত হয়েছেন কি? শেষটা যদি বিপদে পড়েন, নিজেকে অপরাধী মনে করব যে, আপনি হলেন প্রাণদাত!'

কম্পিত হস্তে বাঁ হাতের কব্জিতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে নকুড়বাবু বললেন—'আমার পরিকল্পনা তৈরী আছে, আমার জন্যে অত ভাবতে হবে না। তাছাড়া বেশি আগেও যাব না, মাত্র একশো বছর আগে, ১৮৬৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী হলেই আমার চলবে। ঐ তারিখে এই বাড়ির একটা বিয়ে পণ্ড করতে হবে। ব্যস্ আর কিছু নয়।'

অর্ধেন্দু, অর্থাৎ যে নিজেকে অর্ধেন্দু বলে চালাচ্ছিল। সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, দাঁত কপাটি লাগতে সুরু করল, নকুড়বাবু ডায়াল ঘোরাতে যাবেন, তাঁর হাত সে চেপে ধরল নকুড়বাবু এক ঝাকানি দিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলে বললেন—'সরে দাঁড়ান। আপনার বৈজ্ঞানিক গবেষনার ফল ভোগ করবার আমার

ন্যায্য অধিকার নেই বলতে চান? চাবি খুঁজে দিই নি?'

অর্ধেন্দু মরীয়া হয়ে বললে—'আছে, আছে, দিয়েছেন, কিন্তু ওসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলেই কি ভালো হত না, তাছাড়া একটু ব্যবস্থা না গেলে যে আপনি সেকালে পৌঁছবেন একেবারে কাপড় চোপড় ছাড়া হয়ে।'

'শুনে নকুড়বাবু থ'! তা হলে? 'তা হলে কি হবে?'

অর্ধেন্দু আবার সেই শুকনো খটখটে হাসি হাসল।—'আমি বৈজ্ঞানিক, সে ব্যবস্থা কি আর করি নি? কেন আমার গায়ে কি কাপড়-চোপড় নেই বলতে চান?' এই বলে পকেট থেকে দুটি চুলের মত সরু পিন বের করে নকুড়বাবুর জুতোর নীচে আটকে দিল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'যান এবার। কি আছে কপালে কে জানে, দুগ্‌গা দুগ্‌গা, মধুসূদন—' তার কথার সঙ্গে সঙ্গে নকুড়বাবু ডায়াল ঘোরাচ্ছেন, আগে মাস, তারিখ, ঠিক করে তবে সাল ঠিক করলেন। ডায়াল ঘোরাচ্ছেন আর অর্ধেন্দুর কথাগুলো যেন ক্রমে কিরকম অস্পষ্ট হয়ে আসছে, ঘরের মোমবাতি থেকেও যেন বড় বেশি ধোঁয়া বেরুচ্ছে। শেষে এববার মনে হল অর্ধেন্দু ওঁর জুতো পরা পায়ে মাথা ঠেকাচ্ছে, তারপর চট করে একটু চোখে অন্ধকার দেখলেন, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল, সেবার পচা চিংড়ি খেয়ে ঠিক যেমন হয়েছিল, কান বোঁ বোঁ করতে লাগল, হাতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরল।

এক মহূর্তেই আবার নিজেকে সামলেও নিলেন, দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল, হাত পা স্থির হল, খালি কান বোঁ-বোঁর বদলে কোথায় যেন শানাই বাজতে লাগল। ঘরের কোণে যে মোমবাতির জায়গায় কারবাইড গ্যাস জ্বলছে, সেটা প্রথমে খেয়াল হয় নি। গা হাত পা ঝেড়ে ঝুড়ে দেখে নিলেন ; নাঃ, সব ঠিকই আছে, হাতে ঘড়ি, জুতোর নীচে কাঁটা—, 'কি হচ্ছেটা কি? তুই কেরে অলপ্পেয়ে? মিস্তির ঘরে কেন সেঁদিয়েছিস্? মৎলবটা কি তোর?' কানের কাছে কর্কশ গলার স্বর শুনে এমনি চমকে উঠলেন নকুড়বাবু যে প্রথমটা মুখ দিয়ে

কথাই সরল না। তাছাড়া এরকম বিরাট সাইজের মহিলাও তিনি কখনও দেখেন নি। পরনে একখানা চওড়া লালপাড় গরদ, ব্যস স্রেফ আর কিছু নয়। কিন্তু গলার বিছে, কোমরের চন্দ্রহার, হাতের অনন্ত, তাগা, চুড়ি, বালা নিয়ে সের দুইয়ের কম হবে না।

মাথার কাপড় খসে গেছে, গায়েও খুব বেশি নেই; চওড়া সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ, কপালে এই বড় সিঁদুরের ফোঁটা, মুখে পান, পায়ে আলতা, বয়স বছর পঞ্চান্ন। হাঁ করে নকুড়বাবু তাকিয়ে রইলেন, কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না। কিন্তু ভদ্রমহিলা ছাড়বার পাত্রী নন, মহা হাঁক-ডাক জুড়ে দিলেন—'কে তুই? কি চাস কি? আমি বলে খেয়ে না খেয়ে দিনভর মিষ্টির ঘরের দোর আগলাচ্ছি; মতিরানী এসে বললেন কিনা জোড়াসাঁকোর দেবেন ঠাকুর এসেছে, তাই একটু দেখতে গেছি আর অমনি কিনা ঘরে চোর ঢুকেছে? কি নাম তোর?'

ততক্ষণে ভদ্রমহিলার চ্যাঁচামেচিতে সোনার তাগা পরা, গেঞ্জি আর ফিনফিনে ধুতি পরা, টেড়ি কাটা, আতর মাখা দু'তিন জন ফুলবাবু এসে জুটেছেন! সব চাইতে পেছনের বাবুটি আবার কাকে যেন চাপা গলায় বললেন—'এই আমার গুপ্তিটা কোথায় দ্যাখ দিকিনি।'

বেগতিক দেখে নকুড়বাবু আমতা আমতা করে বললেন—'ইয়ে- দেখুন, আমার নাম নকুড় চন্দ্র ঢোল—আমি চোর নই, কিছু একটা ভুল—'

'কি নাম বললেন—ঢোল? ছি, ছি, ছি, বড় বৌদি, কাকে কি বলছ? উনি তা হলে বরের মামাবাড়ির কেউ হবেন। দেখুন জোড় হাতে মাপ চাইছি আমাদের শত অপরাধ হয়ে গেছে, মেয়েদের যদি কোনো বুদ্ধি থাকে, কিছু মনে করবেন না'—দেখতে দেখতে হাওয়া বদলে গেল; নকুড়বাবুর আদর যত্নের তখন আর শেষ নেই। কোথা থেকে স্নানের জল, শান্তিপুরের ধুতি, আদ্দির পিরান, কোঁচানো উড়নি সব এসে গেল, নকুড়বাবু টেরই পেলেন না। একটা রোগা অতি

চালাক চাকর আবার কানের পেছনে আতরের পুঁটলি গুঁজে দিয়ে গেল।

এই রকম ঘটা করে তা হলে সন্ধ্যামণির মায়ের দিদিমার বিয়ে হয়েছিল। শানাই, মিলিটারি ব্যাণ্ড, বাঈ নাচ, যাত্রা, সখের থিয়েটার, কিছু বাদ নেই। নকুড়বাবুর জুতো পালিশ করতে করতে চাকরটা বলে যেতে লাগল—'এ জুতো ফেলে দিন বাবু, এই কি বিয়ে বাড়ির জুতো? নতুন এক জোড়া নিয়ে আসি ঠিক এই মাপে।' আ, সর্বনাশ, জুতো ছাড়বেন কি, জুতোর তলাকার কাঁটাটি খুলে পড়ে গেলেই তো হয়ে গেল, বাড়ি ফিরতে হবে উদোম গায়ে। হাত ঘড়িটাও এদের কাছ থেকে অনেক কষ্টে ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়েছে। জুতো ছাড়াতে না পেরে ক্ষুন্নমনে চাকরটা শেষ পর্যন্ত নকুড়বাবুকে ছেড়ে দিল।

দোর গোড়ায় হাত জোড় করে যে ফর্সা ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই কনের বাবা। এই হেনস্তার কথা যেন বরকর্তার কানে না ওঠে, এই তার মিনতি।

নকুড়বাবু হেসে ফেললেন,—'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, এ আবার একটা কথা হল, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, এ বিষয়ে কেউ বিন্দু বিসর্গও জানতে পারবে না।'

পাশের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখেন যেখানে তাঁদের তিনতলা বাড়ি এমন শোভা পায়, সেখানে ঘোড়ার গাড়ির ভিড়! বরযাত্রীরা সভায় বসেছে, গান বাজনা হচ্ছে, বিয়ের লগ্নের একটু দেরী আছে। নকুড়বাবু উসখুস করছেন, বুঝতে পারছেন বড্ড কাঁচা কাজ করেছেন, অন্তত একটা দিন হাতে রাখা উচিত ছিল, একেবারে লগ্ন এসে গেল বলে, এখন কি করতে যে কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। কন্যাকর্তা তাঁকে নিয়ে বরের কাকা বরকর্তার পাশে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, নকুড়বাবু বুঝি কন্যা পক্ষেরই কোনো শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয়, সুবিধা শুধু এই যে তাঁর কানটি পাওয়া যেতে পারত।

বাঘের মতো চেহারা ভদ্রলোকের, ঝুলো গোঁফ, বাবরি চুল, ঘোর কালো রং, গায়ে অসুরের বল আর এই বড় বড় লোমওয়ালা কান, নকুড়বাবু একটু দমে গেলেও, বুঝলেন শেষ মুহূর্তে ভড়কে গিয়ে পিছপাও হলে, এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তবে বরের বাপের কাছে এগুনো তাঁর কর্ম নয়, বরং বরের কাছে গেলে কিছু হতে পারে মনে হল। একজন পাকা এটর্নির পক্ষে সাক্ষী ভাঙানো খুব শক্ত কাজ নয়। গুটিগুটি গেলেন তার পাশে।

দেখলে মায়া হয়! বয়স বছর কুড়ির বেশি নয়, রোগা, কাকা যেমনি কালো—এ তেমনি ফর্সা, কপালের ওপর গোছা গোছা কোঁকড়া চুল, পরনে জরির বর্ডার দেওয়া পাঞ্জাবি, তার এক পাশে চুনী বসানো বোতাম, গলায় সোনার হার, নকুড়বাবুকে হঠাৎ এত কাছে এসে বসতে দেখে একটু ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। এর ওপর রোমাঞ্চ সিরিজের পুরানো একটা পাঠ লাগাতে নকুড়বাবুর একটু লজ্জাও করছিল, কিন্তু প্রেমের কিম্বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে ওসব বালাই থাকতে নেই, তাই ওর শাখের মতো কানের কাছে মুখ নিয়ে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে, চাপা গলায় বললেন, 'কেটে পড় এখান থেকে যদি ভালো চাও, এ বিয়ে করতে হবে না।'

ছেলেটা যেন কাঠ হয়ে গেল। নকুড়বাবু আরো বললেন, 'চ্যাচামেচি করেছ কি মরা মানুষ হয়ে গেছ'—ঠিক এই কথাই রোমাঞ্চ সিরিজের ক (৫৫) কিম্বা (৫৬)-এর নায়ক বলেছিল। নকুড়বাবু বললেন, 'আস্তে আস্তে হাওয়া হয়ে যাও, সাতদিনের মধ্যে যদি এমুখো হও তো আর দেখতে হবে না। এ মেয়ে তোমার জন্যে নয়। যাও, কর্পূর হও। নইলে তোমাকে আশী বছর জেল খাটানো আমার পক্ষে কিচ্ছু নয়।'

ফলটাও ঠিক রোমাঞ্চ সিরিজের মতোই হলঃ বাস্তবিকই খাসা লেখে ওরা, তা সে ইংরিজী থেকে চুরিই হোক আর যাই হক। ছেলেটা আস্তে আস্তে কখন যে খসে পড়ল, শুধু অন্য লোক কেন, স্বয়ং নকুড়বাবুও টের পেলেন না। একটু নার্ভাস লাগছিল বটে, কোনো-

মতে লগ্নটা পার করতে পারলে আর কোনো ভাবনা থাকে না। ততক্ষণ পর্যন্ত ভাল মানুষ সেজে এইখানে বসে থাকা। অবিশ্যি মেয়েটার জন্যে একটা পাত্র ঠিক করে দিতে হবে, সে বেচারাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। পাত্র কোথায় পাওয়া যায়?

ভিড়ের মধ্যে নকুড়বাবু পাত্র খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, ঐ থামটার পাশে কৌচে বসে, ও-লোকটাকে অর্ধেন্দুর মতো লাগছে না? তাই তো, অর্ধেন্দুই তো বটে, দিব্যি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সেজেগুজে এসেছে, কি মতলব ওর? শেষ মুহূর্তে সব পণ্ড করে দেবে না তো? বুকটা ঢিপ ঢিপ্ করতে লাগল। কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করতে আসে নি তো অর্ধেন্দু? ওর কাছে নিজের উদ্দেশ্যটা ভেঙে বলা বোধ হয় ভুল হয়েছে। যা মনে করেছিলেন ঠিক তাই। অর্ধেন্দু হঠাৎ কৌচ ছেড়ে উঠে গিয়ে কন্যাকর্তার কানে কানে কি যেন বলল। অমনি বর কই? বর কোথায় গেল? খোঁজ খোঁজ রব উঠল। ততক্ষণে লগ্নও এসে গেছে। দেখতে দেখতে চারদিকে হুলুস্থুলু কাণ্ড সুরু হয়ে গেল।

দশ মিনিট বাদে কন্যাকর্তা পাইক এনে নকুড়বাবুকে ঘেরাও করে ফেললেন। সব বুঝেছি, ভালো করে বললাম, তবু কানে তুললেন না। এই ভাবে অপমানের শোধ তুললেন? আচ্ছা, আমিও কম যাই না। এ বিয়ে আজ এ লগ্নে আমি দেবই এবং আপনি যেমন পাত্র ভাগিয়েছেন আপনাকে তার জায়গা নিতে হবে। পাইকরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল।

মরিয়া হয়ে নকুড়বাবু চারিদিকে তাকালেন; কি সাংঘাতিক, নিজের শাশুড়ীর দিদিমার সঙ্গে বিয়ে! বরফের মতো ঠাণ্ডা ঘামে সারা গা ঘেমে উঠল। এমন ফ্যাসাদে কেউ পড়েছে কখনো? হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে অর্ধেন্দুকে দেখা গেল। ততক্ষণে বরপক্ষীয়েরা থানায় খবর দেবে বলে শাসাতে শাসাতে সভা ছেড়ে গেছে। অর্ধেন্দুর মুখে সে যে কি বিশ্রী হাসি। নকুড়বাবুর বিপদ দেখে তার মজা লাগছে। নকুড়-বাবুর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, চিৎকার করে বললেন—'ঐ, ঐ, ঐযে

বর, ঐ দেখুন ছদ্মবেশে এসেছে।'

এক মুহূর্তের জন্য চোখ ফিরিয়ে সকলে অবাক হয়ে সেইদিকে যেই তাকিয়েছে, অমনি নকুড়বাবুও ১৯৬৪ সালের ডায়াল ঘুরিয়েছেন। চাবি দিয়ে মাস তারিখ আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, শুধু সালটি বাকি ছিল। ঐ এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল অর্ধেন্দু সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকাল, তার পরেই সব যেন ধোঁয়া হয়ে গেল, কান বোঁ বোঁ করতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল, পায়ের নীচে মাটি সরতে লাগল, বিয়ে বাড়ির কোলাহল ক্রমে ক্ষীণ শোনাতে লাগল, কেমন যেন ঝাপ্সা ঝাপ্সা মনে হল যে অর্ধেন্দুর মুখের ভাবটা পাল্টে গিয়ে গাল দুটি হাসিতে ভরে গেছে। তারপরেই চমকে উঠলেন নকুড়বাবু, এ কি, হুড়মুড় করে এ যে কোথাকার কোন এঁদো পুকুরে পড়েছেন, এখন প্রাণটা বুঝি যায়।

বেশি দূরে নয়, পাশের বাড়ির বন-জঙ্গলে ঢাকা ঘাট-বাঁধানো পুকুরেই পড়েছিলেন। এ পুকুরটি তাহলে আগে ছিল না, এই জায়গাতেই তো মস্ত চাঁদোয়া খাটিয়ে বিয়ের সভা বসেছিল। কি আশ্চর্য, একশো বছর আগেকার সেই সভা নকুড়বাবু এই মুহূর্তেই ছেড়ে এসেছেন। বাঁহাতের কব্জির দিকে চোখ পড়ল, কি সর্বনাশ, ঘড়িটা কোথায় খুলে পড়ে গেছে, শুধু খানিকটা ছেঁড়া তার জড়ানো হাতে··· যাক গে, তাই দিয়ে আর কি হবে, কার্যসিদ্ধি তো হয়েই গেছে। তার গুলোকে খুলে পুকুরে ফেলে দিতে গিয়ে নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়ল। আঁতকে উঠলেন নকুড়বাবু। কি ভয়ংকর, তাঁর যে পরনে কিছু নেই! এতক্ষণ পরে মনে পড়ল বিয়ের আসরে পিন-আঁটা জুতোজোড়া খুলে রেখে, ফরাসে বসে মখমলের তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে আরাম করেছিলেন।

একটু হাসলেন নকুড়বাবু রোমাঞ্চ সিরিজের নায়করা এত অল্পে কখনো ভড়কায় না ; তাঁরও আজ রাতের অভিজ্ঞতা তাদের অভিজ্ঞতার চাইতে কম নয়। তা ছাড়া এখন শেষরাত, দর্শক কেউ কোথায় নেই! নিঃশব্দে বুগানভিনিয়া লতাগাছ বেয়ে নকুড়বাবু তিন তলার

ছোট ছাদে গিয়ে উঠলেন। তারপর দরজার কাচের মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে, ছিটকিনি নামিয়ে, ঘরে ঢোকা কিছুই শক্ত নয়। বলা বাহুল্য, এ পথে যাওয়া-আসা করা এই তার প্রথম নয়। বিষ্টুদাই প্রথম বুদ্ধি দিয়েছিলেন যে, তিনতলার ঘরের ভিতর থেকে ছিটকিনি এঁটে, এই-ভাবে যাওয়া আসা করলে কাকপক্ষীও টের পায় না।

পাশেই স্নানের ঘরে গিয়ে খুব খানিকটা গায়ে মাথায় জল ঢেলে, শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, ফর্সা কাপড় পরে নকুড়বাবু যখন শয্যাগ্রহণ করলেন, কালান্তরে যাত্রার সমস্ত গ্লানি তখন কেটে গেছে, খালি খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। বিয়ে বাড়ির পেল্লায় খাওয়া ছেড়ে এলেন বলে একটু দুঃখও যে না-হচ্ছে তাও নয়। যাই হোক, নিজের কানে, নিজের দেখে, নিজের ঘরে বড় এক ঘড়া ঠাণ্ডা জলই বা মন্দ কি! একবার পাশের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একঘণ্টা আগেও সেখানে বিয়ের হট্টগোলে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল, এখন সেখানে সব অন্ধকার নিঝুম, এর মধ্যে একশো বছরের ব্যবধান। কি কলই করেছে অর্ধেন্দু! বালিশে মাথা রাখা মাত্র গভীর ঘুম।

সে ঘুম ভাঙল—অনেক বেলায়, সন্ধ্যামণির ব্যাকুল ডাকাডাকি আর দরজার ধাক্কাতে। সন্ধ্যামণি? সন্ধ্যামণির তো আসবার কথা নয়। তবে কি শেষ পর্যন্ত কচি বরটাকেই ধরে আনা হয়েছিল? এত করেও কি তবে সব পণ্ড হয়ে গেল। দরজা খুলতেই সন্ধ্যামণি একেবারে আলুথালু বেশে ছুটে এসে তাঁর পায়ে পড়ল।—এ কেমন সন্ধ্যামণি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, বেশ দেখাচ্ছে লাল লাল গাল দুটো আর তার মুখে একি সব অদ্ভুত কথা!—'আমাকে ক্ষমা কর। মাসি বলেছে অত শাসন করলে তুমি কোথায় পালিয়ে যাবে, মেসো নাকি তাই গেছিল। ওগো আমায় ফেলে কোথায় যেয়ো না!'

কেমন যেন মনটা নরম হয়ে গেল নকুড়বাবুর; নীচু হয়ে তুলে ধরলেন সন্ধ্যামণির দু'মন দেহখানি। কানের ওপর চোখ পড়ল, দেখলেন বেশ বড় কান, তার লতি জোড়া। আর মুখে কথা সরে না। সন্ধ্যামণি চোখ মুছে, কুঁজো থেকে জল ঢেলে নিজের হাতেমুখে

দিল, বাকিটুকু পায়ের ওপর ঢালল। বিস্ময় বিস্ফারিতলচনে নকুড়বাবু দেখলেন পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে খানিকটা আলগা আলগা চামড়া, অনেকটা হাঁসের পায়ের মতো।

সন্ধ্যামণি একটু অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বলল—'আমার মামার-বাড়ির সক্কলের এই রকম পায়ের আঙ্গুল আর জোড়া কানের লতি।' আনন্দে অধীর হয়ে নতুন সন্ধ্যামণিকে নকুড়বাবু দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। অর্ধেন্দুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল। তবে সাক্ষাৎ বুড়ো দাদাশ্বশুর বারে বারে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন মনে করে লজ্জাও পেলেন।

———

অহিদিদির বন্ধুরা

অহিদিদির স্বামী যখন পেন্‌শন্ নেবার পর গোরিয়া ছাড়িয়ে কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ে নতুন-খোলা এক হাতের কাজ শেখাবার স্কুলের প্রায় মিনি-মাগনার অধ্যক্ষ হয়ে, সপরিবারে সেখানে চলে গেলেন, কেউ বলল, "পাগল" কেউ বলল" স্টুপিড্" আর বেশির ভাগ বলল, "ঠিক ওঁরই উপযুক্ত কাজ হয়েছে!" পরিবার বলতে অহিদিদি আর তাঁর বুড়ি শাশুড়ি।

অবিশ্যি আজ পাড়াগাঁ ঠিক নয়, এককালে ভাবি বর্ধিষ্ণু শহর ছিল, বোধ হয়। একটা মজা নদী গিয়ে গঙ্গায় পড়ত; নাকি মস্ত বন্দর ছিল; ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘাঁটি, রড় বড় বজরা এসে নোঙর ফেলত। মস্ত মস্ত ভাঙা ঘাট এখনো দেখা যায়। কিছুদিন আগে গ্রাম-সংস্কারক দুর্দান্ত ছেলেরা কাদা তুলতে গিয়ে মর্চে ধরা নোঙর আর অনেক মরা মানুষের কঙ্কাল তুলে, কাজ ফেলে পালিয়েছিল। অহিদিদির দেওর ধরণীবাবু বলেছিলেন কাদার নিচে নিশ্চয় মেলা ডুবো জাহাজ আছে। সরকার যদি'বুদ্ধি করে এখানে হাতের কাজ শেখার ইস্কুল না করে, নদীর কাদা তোলার ব্যবসা খুলত, তাহলে

তিন ডবল লোক চাকরি পেত আর সোনা-দানায় সব ব্যাটার ট্যাঁক ভরতি হত। অহিদিদির স্বামী সুরেনবাবু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেও, অহিদিদি একবার গিয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখে হতাশ হলেন। মজা নদীতে বর্ষাকালেও হাঁটু জল হয় না, এখন পূজোর সময় পায়ের কব্‌জি ডোবে না তলাটা ইঁটের মতো শক্ত।

বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। বুড়ি শাশুড়ি বেজায় খিটখিটে, তার ওপর দুধের ফরমায়েস নিতে এসে গয়লা ফিরে গেছিল, মাছের জন্য হাটে লোক পাঠানো হয়নি ; তোলা উনুন নিবে টিবে একাকার।

গুছিয়ে বসতেই দিন চারেক গেল। এ অঞ্চলটাতে বহু পুরনো পোড়ো-বাড়ির। ধ্বংসাবশেষ ; কয়েকটার দুটো একটা মহল মেরামত করে মালিকরা বাসযোগ্য করে রেখেছে। কয়েকটা পড়ে গিয়ে ইঁটের স্তূপ হয়ে আছে ; যত রাজ্যের সাপ-খোপের বাস। আর কতকগুলো যে-কোনো সময়ে ধ্বসে পড়বে ; সেদিক দিয়ে বাসিন্দাদের অদ্ভুত রকম নিশ্চিন্ত বলতে হবে। চারদিকে মস্ত মস্ত আম কাঁঠালের বাগান, যত্নের অভাবে নাকি ফল হয় না। মস্ত মস্ত পুকুর, তার পাঁক তোলা হয় না ; মাছের চাইতে ব্যাঙ বেশি। একটা বেজায় পুরনো পাথরের তৈরি বিষ্ণু মন্দির, তাতে কষ্টি-পাথরের বিষ্ণুর পাশে লক্ষ্মী। পূজুরি নেই ; গয়লাপাড়ার বাসিন্দারা দু বেলা ফুল, গঙ্গাজল, বাতাসা দিয়ে আসে। এ দিকটাই নাকি সেকালে বড়লোক শেঠদের পাড়া ছিল। গুপ্তধন থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। গয়লারা শেঠদের দুধ জোগাত, ফাইফরমায়েস খাটত।

মোট কথা, দিনের বেলা অত কিছু মনে না হলেও, সন্ধ্যেবেলায় জায়গাটা বেজায় নির্জন হয়ে যেত। তার ওপর চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। কালিঘাটের সরু রাস্তাটাতে প্রত্যেকটা বাড়ির প্রত্যেকটা কথা শোনা যেত। এত গায়ে গায়ে বাড়ি যে চোর ঢুকবার জায়গা ছিল না। দিনের লোকদের হট্টগোল থামলেই, রাতের লোকদের হট্টগোল শুরু হত। মাত্র দু ঘন্টার জন্য, রাত দুটো থেকে চারটে একটু নিঝুম হত। এখানে সন্ধ্যা না নামতেই মাঝরাত।

সুরেনবাবু কিছু দেখে শুনে বাড়ি নেন্‌নি। যা দিয়েছে, অমনি এসে উঠেছেন। কাছে পিঠে অন্য কেউ নেই। যত রাজ্যের পোড়ো বাড়ি আর মান্ধাতার আমলের আম-বাগান। এ-বাড়িটারো নয়-

ভাগ ভেঙে এই একটা ভাগ টিকে আছে। তবে এটাকে ভালো করে মেরামত করা হয়েছে। সেকালে হয়তো এটা কোনো বড়

লোকের অন্দর মহলের খানিকটা ছিল। দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি তিনখানা শ্বেত-পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘর, পাশে কল-ঘর আর পূর্ব দিকে এই রান্নাঘর, এর মধ্যেই ভাঁড়ার ঘর। আলাদা ভাঁড়ারের কি দরকার? সব খুলে ফেলে রেখে দিলেও কেউ নেবে না। কালিঘাটে জানলার শিকের ওপর জাল দিতে হয়েছিল, নইলে আঁকশি ঢুকিয়ে পুরনো গামছা পর্যন্ত নিয়ে যেত। আর এখানে ভুলে সারারাত পেতলের ঘড়া বাইরে ফেলে রাখলেন, সকালে উঠে দেখলেন ঘড়া তো খোয়া যায় নি, বরং কিছু লাভ হয়েছে। পুরনো গন্ধরাজ লেবু গাছের মগ্ ডালের রস টুসটুসে লেবুগুলো কেমন করে খসে পড়ে আছে ঘড়ার ভিতরে।

রান্না ঘরের সামনে চওড়া রক; তারপর সান বাঁধানো উঠোন; উঠোনের ধারে কুয়ো, লেবু গাছ, সজনে-গাছ, বেল গাছ আর রান্না-ঘরের মুখোমুখি ভাঙাচোরা গোয়াল-ঘর। সেখানে শেষ গোরু হয়তো থেকে গেছে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে। গয়লানী সকালে আড়াই সের আর এ বেলা আধ সের ঘন লালচে সুগন্ধী দুধ দিয়ে গেছে। খিট্‌খিটে শাশুড়ি আজকাল রান্নাঘরে আসেন না; এক দিক দিয়ে সেটা কিছু মন্দ না। তিনি দু বেলা দু বাটি এক বল্‌কা দুধ খান। সেটা আলাদা করে তুলে রাখা হয়। দু বেলার চায়ের দুধ ও আলাদা করা হয়। বাকিটা পড়ন্ত আঁচে বসিয়ে রাখা হয়; আধ ইঞ্চি পুরু সর পড়ে; সোনালী রঙ, তাতে চাঁদের গায়ের মতো ফুট্-ফুট্ দাগ। রাতে সেই সর তুলে মধ্যিখানে কাশীর বাটা চিনি ছড়িয়ে, ভাঁজ করে রাখেন অহিদিদি। শাশুড়ি এক চিলতে খান; সুরেনবাবু অর্ধেকটা মতো খান; কেউ এলে একটু খায়; কিছু বাকি থাকলে অহিদিদি চাখেন। রান্নাঘরের দরজায় শিক্‌লি তোলা থাকে, জানলায় বেড়ালের ভয়ে স্কুলের কর্তৃপক্ষই নতুন জাল লাগিয়ে দিয়েছেন। সরটি রোজ সুগন্ধী গোল টৈ-টম্বুর হয়ে থকে।

দুপুরের একটু মাছ তোলা থাকে। রাতে জনতা স্টোভে একটু ছক্কা করেন অহিদিদি, দুজনার জন্য খান-কতক হাত রুটি করেন, কি

অল্প তেলে পরটা ভাজেন। ঘন্টা খানেক ও লাগে না। বিকেলে স্কুলের কারখানার ফোরম্যান বাবুর স্ত্রী এসে বললেন, "ওমা! ভয় করে না দিদি? গোয়াল-ঘরের পেছনের দেয়ালে তো এতখানি ফাঁক! একটা দুটো ছোট ছেলে কি রোগা-পানা মানুষ দিব্যি গলে আসতে পারে। আর আপনি কিনা দুধের সর আর রাজ্যের বাসনপত্র ছড়িয়ে রেখে, দরজায় শুধু ছিকলি তুলে ও ঘরে গিয়ে রেডিও শোনেন? বলিহারি আপনাকে।"

কর্তা গিন্নি তাই নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন। কিন্তু রাতে হ্যরিকেন জ্বেলে রান্না ঘরে গিয়ে অহিদিদি দেখলেন সরের এক পাশ থেকে খানিকটা কে ছিঁড়ে নিয়েছে; মেঝেতে টপ টপ করে দুধ ফেলেছে; নতুন রঙ করা দেয়ালে ছোট ছোট আঙুল মুছেছে। অহিদিদি কাউকে কিছু না বলে, ঐ দিক থেকে একটুখানি সর কেটে ফেলে দিয়ে, বাকিটাতে চিনি ছড়ালেন। পাথরের বাটিতে তিন জনের জন্য চিনি-পাতা দৈ বসিয়ে, বাটিটা ডেকচিতে রেখে, ঢাকা দিয়ে, শিল-চাপা দিলেন। চায়ের দুধ খাবার ঘরের ডুলিতে রাখলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সকালে গিয়ে গোয়াল ঘরটা দেখলেন। বাড়ি সারানোর জিনিস ছাড়া কিছু ছিল না। তবে পাশের পাঁচিলে সত্যিই খানিকটা ফাঁক। সুরেনবাবু সেই দিনই সেটা সারাবার ব্যবস্থা করলেন। সকালে জেলে-বৌ পঁচাত্তর পয়সায় এক রাশি ছোট ছোট তেল টসটসে খয়রা মাছ দিয়ে গেল। অহিদিদি সবটি তেলে ভেজে, অর্ধেকটা দিয়ে দুপুরে চচ্চড়ি করলেন, বাকিটা রান্নাঘরের ছাদ থেকে ঝোলা শিকের ওপরে তুলে রাখলেন। সন্ধ্যাবেলায় দেখলেন, ঝাঁপি কাৎ, নিচে মেঝের ওপর দুটি মাছ পড়ে আছে, শিকেয় তোলা মাছ বেশ কম। অহিদিদি একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গোয়াল ঘরের দিকে চোখ গেল। গোয়ালঘরের উঠোনের দিকে দেয়াল ছিল না, খালি অহিদিদির কোমর অবধি উঁচু শক্ত একটা বাঁশের বেড়া। হঠাৎ মনে হল অন্ধকারের মধ্যে সারি

সারি গোটা দশেক ছোট ছোট মাথা যেন বাঁশের বেড়ার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আর অনেকগুলো রোগা রোগা কালো কালো হাত এ-ওকে ঠেলে সরিয়ে, নিজের জন্য জায়গা করে নেবার চেষ্টা করছে।

অহিদিদির বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। আছে তাহলে ছেলে-পুলে এই নির্বান্ধব পুরীতেও। কালীঘাটের বাড়িতে ছেলেপুলে ছিল না। বাড়িটা ছিল শ্মশান। অহিদিদির ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। শাশুড়ি কোন ছোট ছেলের গলার আওয়াজ পেলে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে যেতেন। কেউ আসত না ওঁদের বাড়িতে, কেউ গল্প শুনতে চাইত না, খাবার চুরি করে খেত না। বাড়ি, না কি শ্মশান। অহিদিদি গলা তুলে ডাক দিলেন।

"কেরে আমার সর খায়, মাছ খায় ?" অন্ধকারের মধ্যে ঠেলাঠেলি চুপ।

অহিদিদি বললেন, "আয়! গোলাপী বাতাসা দেব, ভাজা-মশলা দেব, পরীদের দ্বীপের গল্প বলব।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় করে তারা বাঁশের বেড়া টপকে এগিয়ে এল। আট দশটা রোগা রোগা ছেলে মেয়ে, গায়ে জামা নেই, রুক্ষ চুল, সাদা সাদা দাঁত বের করে ফিক্-ফিক্ করে হাসছে।

অহিদিদি গোলাপী বাতাসার কৌটো খুলে বললেন "কাছে আয়, হাত পাত!" অমনি দশটা নোংরা নোংরা হাত পাতা হল। অহিদিদি একটা করে বড় বাতাসা, একটু করে ভাজা-মশলা দিয়ে সামনেরটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর নাম কি রে ?'

ছেলেটা একটু খোণা। বলল "বঁগেশ।"

"এরা বুঝি তোর দল ? ভ্যাখ, ও-সব খাবার দাবার-এ হাত দিস্ নে। কেউ ছুঁলে বুড়ি ঠাকুমার খাবার নষ্ট হয়। আমি রোজ তোদের খাবার দেব।"

বগেশ বলল, "কি দেবে ?"

"কেন, মুড়ি ল্যাবেনচুশ দেব, পান দেব, কুচো নিমকি দেব, নোন্তা বিস্কুট দেব, আলু নারকেল ঘুগনি দেব, কুচো-চিংড়ি ভাজা

দেব। কিন্তু নিজেরা কিচ্ছুটি নিবি না, কেমন ?”

বগেশ মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

অহিদিদি জনতা-স্টোভ রকে এনে, আটার নেচি কাটতে কাটতে বললেন,

“এখন খাওয়া হল তোদের, ঐখেনে বসে পড়, আমি তোদের পরীদের দ্বীপের গল্প বলি।”

ওরা যে যেখানে ছিল শান-বাঁধানো উঠোনের ওপর বসে পড়ল। অহিদিদি বললেন, “অনেক অনেক দিন আগে রমেশ বলে একটা দুষ্টু ছেলে ছিল, তার মা ছিল না, সৎমা ছিল।”

বগেশ বলল, “রঁমেশ না, বঁগেশ।”

অহিদিদি বললেন, “বেশ, তাই হবে, রমেশ না বগেশ। সৎমা বগেশকে খেতে দিত না, পরতে দিত না, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাটাত। শোবার জন্য খাট দিত না, রাতে বগেশ ছাগলদের সঙ্গে শুত।......”

অহিদিদি গল্প বলে চলেন আর ক্রমে ওরা কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। ক্রমে অহিদিদির পরটা ছক্কা রান্নাও শেষ হয়, গল্পও শেষ হয়। আগে একটু জায়গা নিয়ে রেষারেষি, কোঁৎ কাঁৎ শব্দ হচ্ছিল, শেষের দিকে সব চুপ!

অহিদিদি গল্প শেষ করলেন, “তারপর রক্তাক্ত গায়ে ধুঁকতে ধুঁকতে, হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁদতে কাঁদতে বগেশ গিয়ে সমুদ্রের তীরে আছড়ে পড়ল। অমনি সেই সুঁটকো বুড়ির নৌকো এসে তীরে ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির গা থেকে আলো বেরোতে লাগল, সুঁটকো বুড়ি পরী হয়ে গেল আর মা, মা, মা বলে বগেশ তার কোলে লাফিয়ে পড়ল। দুজনকে নিয়ে নৌকো পরীদের দ্বীপে চলে গেল।”

গল্প শুনতে শুনতে ছেলেমেয়েগুলো অহিদিদির পায়ের কাছে গাদা-গাদি হয়ে পড়েছিল। অহিদিদি স্টোভ নিবিয়ে, খাবার তুলে, বললেন, “আজকের মতো হল, মানিক, বুড়ি ঠাকুমার খাবার সময় হল, কাল আবার আসিস্। ঝুরি ভাজা খেতে দেব আর ঘুঁটেকুড়ুনীর

রানী হবার গল্প বলব।"

এই বলে রান্নাঘরের দোরে শিকলি তুলে, এদিক ফিরে দেখলে ছেলেমেয়েগুলো নিমেষের মধ্যে ভেগেছে।

আর খাবার চুরি হত না সেদিন থেকে! আর অহিদিদি একা পড়তেন না। সন্ধ্যাবেলার ভয়-ভাবনা একেবারে দূর হয়ে গেল। কোনো চোর বা ভূত বা দুষ্টুলোক ঐ ছোঁড়াগুলোর চোখ এড়িয়ে আসতে পারবে না। বগেশ আমসি চুষতে চুষতে বলত, "কোঁনো ব্যাটা-চ্ছেলেকে এদিকে এগুতে দেব না, মা।" অহিদিদি গল্প শেষ করে বললেন, "তোরা সব এত রোগা কেন রে? থাকিস্ কোথায়?" বগেশ পুরনো আম কাঁঠাল বটের বনের দিকে দেখিয়ে বলত, "ঐ হোথা মোদের আস্তানা।" অহিদিদি বলতেন, "ওগুলো কথা বলে না কেন? সব বোবা নাকি?" তাই শুনে সব খিলখিল করে হেসে উঠত। বগেশ বলত, "লজ্জা পায়। জিব-কাটাদের বড় লজ্জা, মা।" অহিদিদি বললেন, "দূর ব্যাটা, যারা বড্ড কথা বলে তাদের জিবকাটা বলে। কাল তালের বড়া করব, তালের ক্ষীর করব। খাবি তো?" তাই শুনে সব এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল! অহিদিদিও রকে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন। আহা, খেতে পায় না নিশ্চয়, নিশ্চয় পাতার কুঁড়েতে থাকে; মা-বাবাগুলো মানুষ না; অভাবে অনটনে—হয়তো এগুলোকে বেদম পেটায়! ওদের সুখী কর ঠাকুর।

এমনি করে প্রায় চারটে মাস কেটে গেল। সুরেনবাবুদের জন্য স্কুলের কাছে চমৎকার নতুন কোয়ার্টার তৈরি হয়ে গেল। অহিদিদি বললেন, "ওমা, বলে কি, পৌষ-মাসে কখনো বাড়ি বদলাতে হয়? মাঘ পলে যাব!"

ছেলেপিলেগুলোর ওপর বেজায় মায়া; দিনগুলোকে ওরা দিব্যি জমিয়ে রেখেছিল। ওরা যে নতুন কোয়ার্টারে যাবে না, সে বিষয়ে অহিদিদির কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রাণ ধরে চলে যাবার কথাটা ওদের বলতে পারছিলেন না। ওদেরো নিশ্চয় কষ্ট হবে, কে খাওয়াবে কালো কালো রোগা গরীবের ছেলেদের।

পৌষ পার্বণে আহিদিদি পাটিসাপটা, গোকুলপিঠে, নারকেল-নাড়ু, দুধ-পুলি করে সবাইকে খাওয়ালেন। সুরেনবাবুর সহ-কর্মীরা বেজায় প্রশংসা করলেন। শাশুড়ি বারণ শুনলেন না. তিনটে পাটিসাপ্টা, এক বাটি দুধ-পুলি খেয়ে ফেললেন। আর সবাই চলে গেলে, সুরেনবাবুও তাস খেলতে মুকুন্দদের ওখানে গেলে, অহিদিদি রান্নাঘরের রকে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "অ্যাই, বগেশ!" অমনি ফিক-ফিক করে হাসতে হাসতে দশটা ছেলেমেয়ে হাজির হল। অহিদিদি সাধ মিটিয়ে ওদের খাওয়ালেন। তার আগে ঘটি থেকে জল ঢেলে হাত ধোয়ালেন।

খাওয়া শেষ হলে সবাইকে একটা করে পান দিয়ে অহিদিদি বললেন, "আমরা ইস্কুল পাড়ায় উঠে যাচ্ছি, জানিস্ বোধ হয়?"

বগেশ সকলের হয়ে বলল, "হুঁ!"

"যাবিনে আমাদের নতুন বাড়িতে?" সবাই জোরে জোরে মাথা নাড়ল। অহিদিদি বললেন, "আমার দুঃখু হবে।" বলে আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। তাই দেখে সব কটা ফোঁচ্ ফোঁচ্ করে একটু কাঁদল। তারপর বগেশ বলল, "মোরাও থাকবনি, মা, মোরাও চলে যাব।" "কোথায় যাবি রে? পারিস্ তো আমাদের বাড়িতে আসিস্।" খুসিতে সব মাথা দোলাতে লাগল। রান্নাঘরের শিকলি তুলে অহিদিদি ফিরে দেখেন সব পালিয়েছে। ভাবলেন আর ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। খুব কষ্ট হল।

পরদিন সকালে বাক্স-প্যাঁটরা, বাসনের সিন্দুক, বিছানা সব নতুন বাড়িতে রওনা করে দিয়ে, সুরেনবাবুকে আর শাশুড়িকে একটা সাইকেল-রিক্শাতে তুলে দিয়ে, অহিদিদি স্বামীকে এই প্রথম মিথ্যা কথা বললেন। 'তোমরা এগোও, আমি গয়লা-বৌয়ের টাকা দিয়ে, তাকে সঙ্গে করে আসছি।"

সমস্ত উঠোন, গাছতলা, গোয়াল-ঘর দেখলেন; পাঁচিল মেরামত হয়েছিল; কিন্তু যাদের আসবার তারা ঠিকই পাঁচিল টপকে আসত। অহিদিদি আম বনে ঢুকে অনেকখানি ঘুরে এলেন, কোথাও কোনো কুঁড়েঘর কি বস্তি দেখতে পেলেন না। তখন তাদের আরেকবার

দেখবার আশা ছেড়ে দিয়ে, একটা রিক্‌শা নিয়ে নতুন কোয়ার্টারে চলে গেলেন।

এর দু-মাস পরে, ছোট মেয়ে-জামাই ত্রিবাঙ্কুর বদলি হল, নাতি নাতনিকে অনেক দিনের জন্য অহিদিদির কাছে রেখে গেল। তখন একদিন গয়লা-বৌ হঠাৎ বলে বসল।

"এবার নতুন বাড়িতে উঠে এসেছ, এখন বললে দোষ নেই। কি করে পাঁচ মাস ঐ হানা-বাড়িতে বাস করলে মা, ভেবে পাইনে। সন্ধ্যার পর গ্রামের লোকেরা ও-তল্লাটে যায় না, জিব-কাটাদের ভয়ে। তোমরা কিছু দেখনি ?"

অহিদিদি কাঠ হলেন। শাশুড়ি বললেন, "কি বলছ বৌ ? জিব-কাটা আবার কি ? আমরা কাউকে দেখিটেখিনি। কে ওরা ?"

"ওমা ! শোননি ঠাকুমা ? ঐ বাড়িটা ছিল এক মস্ত সদাগরের। একবার ভোর বেলায় গয়লাদের ছেলে-মেয়েরা পৌষ-পার্বণের বাসি পিঠে খেতে এসে এমনি হট্টগোল করেছিল যে কর্তা তাদের ন'জনের জিব কেটে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড়টা পালিয়েছিল।

সে-ও আজ দু-শো বছরের কথা হবে। গয়লা-পাড়ায় আমরা আজ-ও তাই নিয়ে দুঃখু করি। তারপর থেকে নাকি আম-বাগানে আর বোল ধরে না আর আশ্চর্যের কথা কি জান মা, এক্ষুণি দেখে এলাম গাছে গাছে মুকুল এসেছে। যাই, মা, এসব হলে আমরা দুঃখীরা দেবতাদের পূজো দিই।"

———

পেটেণ্ট

কলকাতায় একটি সরকারি আপিস আছে, সেখান থেকে সব নতুন উদ্ভাবনের পেটেণ্ট দেওয়া হয়। অর্থাৎ লিখিত-পড়িত ভাবে, যে উদ্ভাবনের মালিক-তা সে উদ্ভাবক নিজেই হক, কিম্বা তার কোন নগদ ক্রেতাই হক, বা উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধিই হক, সে সাক্ষী-

সাবুদ সহ আবেদন পত্র দিয়ে ঐ আপিসের কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করে, যথাবিহিত টাকা কড়ি জমা রেখে, তবে পেটেণ্ট পেতে পারে। পেটেণ্টের জিনিসের একটা নাম ও সংখ্যাও বোধহয় দেওয়া হয়। তাহলে আর কেউ ঐ নাম সংখ্যা ব্যবহার করতে বা ঐ জিনিসের নকল করতে পারে না।

কথাটা বলতে যত সহজ শোনাল, কার্যতঃ তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। ফলে ঐ আপিসের অধিকাংশ কর্মচারী স্নায়বিয় দুর্বলতা আর অনিদ্রায় ভোগেন। এই কলকাতা শহরেই যে কত লক্ষ আশ্চর্য সব নতুন যন্ত্রপাতি প্রতি বছর তৈরি হয় আর কত হাজার উদ্ভাবক যে হতাশার গ্লানি নিয়ে দিন কাটান, কে তার হিসাব রাখে।

হতে পারে তাঁদের বেশির ভাগই খ্যাপা ও খামখেয়ালী কিন্তু এই ধরনের লোকেরাই যে পৃথিবীর অধিকাংশ অভাবনীয় আবিষ্কার করে থাকে সে কথাও কারো অজানা নেই। বলা বাহুল্য পৃথিবীর অন্যান্য আপিসের মতো এ আপিসও নিরেট, নীরস, কল্পনাশূন্য। যার চাক্ষুষ প্রমাণ পাচ্ছেন তাও এরা সব সময় সমর্থন করেন না। মালিক সব কথা খুলে বলেন না বলে, অথচ বলবেন-ই বা কোন সাহসে ? গোপন কথা তো আর পাঁচ কান করা যায় না। তাই শতকরা ৯৯½ জন লোককেই পত্র পাঠ ভাগিয়ে দেওয়া হয়। আর ঐ বাকি ½ খানা মানুষ পেটেণ্টের কাগজ পত্র নিয়ে সেই যে ডুব মারে আর তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না।

যাদের ভাগানো হল তাদের মধ্যে কত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী থেকে যায়, তাই বা কে বলতে পারে ? যেমন সেদিনের সেই খেমো লোকটি। হরিদাস বাবু বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। মনে তাঁর কোনো শুখ শান্তি ছিল না! অথচ খেমো লোকটির চেহারা দেখে কিছু বুঝবার জো ছিল না। রোগা, বেঁটে, কালো, তিন দিন খেউরি হয় নি। পান দোক্তা খেয়ে শুধু দাঁত কেন, ঠোঁট পর্যন্ত কুচকুচে কালো। পরনে একটা হাফ হাতা কালো গেঞ্জি-শার্ট, কালো সরু ঠাং প্যাণ্টেলুন, তৈরি হয়ে অবধি কোনটা কাচা

হয়েছে কি না সন্দেহ। নস্যির গন্ধ। জঘন্য রুমাল দিয়ে সারাক্ষণ মুখ মোছে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, এখন তার কালো রং আর হাতে তার সেই চেনা কালো ব্যাগ।

উঠে আরেকবার জল খেলেন হরিদাসবাবু। তাঁর কাজই হল উট্‌কো লোক ভাগানো। আগেই বলা হয়েছে শতকরা ৯৯½ জনকে পত্রপাঠ ভাগানো হয়। তার মধ্যে ৯০ জনকে ভাগান হরিদাসবাবু। কাগজ পত্রের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আড়চোখে একবার আগন্তুককে আপাদমস্তক দেখে নেন। বেশির ভাগই স্রেফ খ্যাপা। কিন্তু সবার চোখে স্বপ্ন। রাগ ধরে হরিদাসবাবুর। মাথাগুলো আজগুবি চিন্তা দিয়ে ঠাসা। যত রাজ্যের বাজে চিন্তা। তবু চোখে কিসের স্বপ্ন।

এই খেমো লোকটা সব চেয়ে জ্বালিয়েছে তাকে গত পাঁচ বছর ধরে। মাসে একবার করে উদয় হওয়া চাই! এসেই হেসে বলে, "এবার স্যার আমার কথা মানতে বাধ্য হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই! এই দেখুন।" বলে হয়তো মাঝারি সাইজের রেডিওর মতো বড় একটা চার কোনা যন্ত্র বের করে বলল, "রাতে যখন সব শব্দ থেমে যাবে, তখন এটা দিয়ে গত একশো বছর ধরে এখানে যে যা বলেছে বা আওয়াজ করেছে, সব শোনা যাবে।'

হরিদাসবাবু বললেন, "কাগজ পত্র দেখি।" খেমো লোকটা এ পকেট সে পকেট হাতড়ে বলল, "পাচ্ছি না তো।" হরিদাসবাবু বললেন, "নেক্সট্।"

আরো অনেকে ঘন ঘন অসে। তারা অন্য রকম। টাকা হাতে গুঁজে দিতে চায়। ঘরে করা সন্দেশ আনে। জয়নগরের মোয়া আনে। তাদের উদ্ভাবনও সব সংসারী ব্যাপার। মাখন তোলার নতুন কল। নারকেল কোরা টিনকাটা। একজন একটা বালতিতে চাকা বসিয়ে কাপড়-কাচার মেশিন আনল। কত রকম উনুন। লুচি বেলার যন্ত্র। মশলা গুঁড়োর যন্ত্র। বললাম না যত সব ঘরকন্নার জিনিস। এরাই অনেক সময় উৎরে যায়।

খেমো লোকটা অন্য ধাতুর। এই পাঁচ বছরে পঞ্চাশ-ষাটটা উদ্ভাবন এনেছে। সবগুলো উদ্ভটের একশেষ। বৃষ্টির ফোঁটা বড় করার জন্য খুদে একটা পিস্তলের মতো কি। ভালো ভালো স্বপ্ন দেখার কল। মার্বেলের মতো কি জিনিস কানে পরে শুতে হবে। ওতে কি আছে, তা কিন্তু বলল না কিছুতেই। আক্ষেপ রোধ করার ওষুধ ; নাকি বেশির ভাগ মানসিক রোগের কারণ অনুতাপ, আক্ষেপ। ঐ বড়ি খেলে সে সব দূর হয়, পাগল সেরে ওঠে! কাগজে দেখা গেল বড়ির প্রধান উপকরণ সেঁকো বিষ। ঐ ওষুধ একটু পেলে, হারিদাসবাবু এক্ষুনি গিলে ফেলেন। হ'ক সেঁকো বিষ। আবার উঠে আরেক বার জল খেতে হল। লোকটার অবস্থা গোড়ায় বেশ ভালই ছিল। অন্তত কাপড় চোপড় আর গোলগাল ফরসা চেহারা দেখে তাই মনে হত। তখন অনেক কথা বলত। নাকি পাটনায় কোনো দোকানের সহকারী ম্যানেজার ছিল। স্ত্রী পুত্র পরিবার, মায় একটা ছোট বাড়িও ছিল। চাকরি ছেড়ে সব বেচে বুচে, পৈত্রিক বাড়িতে উঠেছিল, বাকি জীবনটা উদ্ভাবন করে কাটাবে! মাথায় যত নতুন নতুন বুদ্ধি আসে, সে-সব নষ্ট হতে দেওয়া মহাপাপ। বলা বাহুল্য বাড়ির লোকেরা রেগে টং।

এই পাঁচ বছরে যেমন পঞ্চাশটি উদ্ভুটি আবিষ্কার করেছে, তেমনি জমানো টাকা, বাড়ি, আসবাব, স্ত্রীর গয়নাগাটি, ইন্সিওরেন্স পলিসি, একে একে সব ভাঙিয়েছে। এখন স্ত্রী বি-এ বি-টি পাস করে, বাপের বাড়িতে থেকে ছেলে মেয়ে মানুষ করছে। তারপর একটু হেসে বলেছিল, "এক রকম ভালোই হয়েছে। একটা চালা ঘরে থাকি আর গবেষনা করি।" তা গত দুবছর নিজের বিষয়ে কথাবার্তাও বিশেষ বলত না, খালি উদ্ভাবনের কথা। হরিদাসবাবু বেজায় বিরক্ত। এরকম একটা অপদার্থ মানুষ যে ভূভারতে থাকতে পারে, এ তাঁর জানা ছিল না। হাজার গালাগাল দিলেও গায়ে মাখে না। সাংসারিক কর্তব্যগুলোকে হাঁসের গায়ের জলের দাগের মতো ঝেড়ে ফেলে। যাচ্ছেতাই বললেন সেদিন হরিদাসবাবু, যে কোনো ভদ্রলোকের

সে-সব কথা অসহ্য মনে হত, এই সাদা কাগজে লেখা যায় না এমন সব কথা।

এতটুকু রাগল না সে, একটু অপ্রস্তুত হেসে বলল, "সত্যি ভারি অন্যায় করি। কিন্তু আপনি জানেন কি আকাশের নীলটা আসলে কিছু নয়, স্রেফ্ ফাঁকার রং, ওর পদার্থ নেই, তার মানে কিনতে খরচও নেই। কোনমতে যদি ওটাকে ধরার ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে আর দেখতে হবে না, গিন্নির সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেব!"

বলে চশমার কাচের মধ্যে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল। বাস্তবিক অদ্ভুত চোখ দুটো। কেমন নীল নীল ছায়া লাগা, যেন তার তল নেই। ভারি অস্বস্তি লাগে। হরিদাসবাবুর রাগটাও ঝপ করে পড়ে গেল। বললেন, "কেন যে নিজের আর নিজের পরিবারের এমন সর্বনাশ কচ্ছেন বুঝতে পারি না। রেখে দিন নীল রং। যা নেই তা ধরবেন কি করে তা বুঝলাম না। দাড়ি কামাবার পুরনো ব্লেডে ধার দেবার একটা যন্ত্র বানালেও তো কাজে দিত।"

খেমো লোকটা শিউরে উঠল। তারপর ঝোলাটা তুলে নিয়ে বলল, "এই উদ্ভাবনটা সেরকম মন্দ ছিল না কিন্তু। এটা সেরকম উদ্ভুট্টি নয়। পৃথিবীর তিন ভাগ জলের মধ্যে এক ভাগ স্থলের চেয়ে তিন গুণ খাদ্য গজায়। সেগুলো না-গাছ, না জানোয়ার, কাঁটা নেই, হাড় নেই, বিচি নেই, ছিবড়ে নেই, তবে হ্যাঁ, তুলে আনার অসুবিধে। এই টেবিল ঘড়ির মতো জিনিসটার সাহায্যে ওরা নিজেরাই উঠে আসতে পারে, তা জানেন? পৃথিবীর খাদ্য সমস্যা ঘুচে যায়। সেটা কি খারাপ?"

হরিদাসবাবু একটা ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "বেশ, বলছেন যখন। স্পেসিফিকেশন সহ কাগজ পত্র রেখে যান। দেখি কি করতে পারি।"

খেমো লোকটি যেন আকাশ থেকে পড়ল, "স্পেসিফিকেশন? কাগজপত্র? সে-সব কোথায় পাব বলুন, গরীব মানুষ? কাগজপত্র কিনি না। সব আমার এই মগজে লেখা থাকে। হারাবার, ছিঁড়বার,

ভিজবার, ছিনতাই হবার ভয় নেই। ও-সব দিয়ে হবেটা কি বলতে পারেন? একটা ফী জমা দিতে পারি, চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করেছি। পেটেণ্টটা দিয়ে দিন। তারপর যতগুলো মেশিন চান সরবরাহ করব। অবিশ্যি অগ্রিম দাম দিতে হবে। দেউলে মানুষ। বৌ যা পাঠায় তাতে কোনমতে খাওয়া-পরাটা চালাই।”

হরিদাসবাবু রেগেমেগে তাকে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। খানিক দুর্বলতার জন্য বেশ লজ্জাই হচ্ছিল। ভাবলেন আপদ গেছে! এরপর আর ব্যাটা এ-মুখো হবে না। বৌ চাকরি করে টাকা পাঠায়, তাতে চলে, অথচ এতটুকু লজ্জা নেই। ওর মুখ দেখাও পাপ।

দেড় মাস না যেতে খেমো লোকটি আজ সকালে আবার এসেছিল। সেই রকম নীল ছায়া-লাগা চোখ দিয়ে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, “তা গতবার যতই রাগুন না কেন, এবার যে মোক্ষম জিনিস এনেছি, এবার আর ফেরাতে পারবেন না। এই দেখুন।”

এই বলে পকেট থেকে চার-পাঁচটা লুডো খেলার ঘুঁটির মতো খুদে খুদে লাল চাকতি বের করে, হরিদাসবাবুর সামনে ফেলে, হাসি হাসি মুখে চেয়ে রইল!

হরিদাসবাবুর দাঁত ব্যথা করছিল। সে বড় বিশ্রী ব্যাপার, একেবারে কানের ভেতর পর্যন্ত কট্‌কট্ করছিল। হাঁড়িমুখ করে বলেছিলেন, “কি হবে ও-সব লুডো খেলার ঘুঁটি দিয়ে? আপনার কি মশাই, সময়ের কোন দাম নেই? মাসের পর মাস এই সব যত রাজ্যের বাজে খেলনা নিয়ে এসে আমার সময় নষ্ট করেন; যান। এখানে আর আসবেন না। এটা পাগলাগারদ নয়।”

এই বলে হাত দিয়ে ঘুঁটিগুলো টেবিল থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন লোকটার চোখের মধ্যেকার নীল আলোটি দপ্ করে নিবে গেল। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে সে মাটি থেকে ঘুঁটিগুলো তুলে পকেটে ভরতে লাগল। হাতটা বেজায় কাঁপছিল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “নিলে ভালো করতেন। গতবার পৃথিবীর খাদ্য সমস্যা ঘুচোবার কলটি একটু পরীক্ষা করেও দেখলেন

না। খাদ্যের চেয়ে বড় জিনিস কি জানেন? মানুষের প্রাণ। এই ঘুঁটি রগে চেপে ধরলে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে, তা জানেন? অবিশ্যি এর-ও কাগজপত্র দিতে পারব না।"

ঠিক সেই সময় দাঁতের ব্যথাটা আরেকবার মোচড় দিয়ে ওঠাতে হঠাৎ রাগে অন্ধ হয়ে, যা কখনো করেননি, কোন দিনও করেননি, হরিদাসবাবু তাই করে বসলেন। আঙ্গুল দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিয়ে কর্কশ গলায় বললেন, "যান বলছি। অনেক সয়েছি, আর নয়। চৌবে। এই পাগলবাবুকে আর ঢুকতে দিও না।" খেমো লোকটার মুখটা সাদা হয়ে গেছিল! চৌবেকে কিছু করতে হয় নি। সে নিজেই অন্ধের মতো হোঁচট খেতে খেতে চলে গেছিল।

দাঁত ব্যথার জন্যই হক, কি যে কারণেই হক হরিদাসবাবু চোখে অন্ধকার দেখছিলেন, হাত ঘামছিলো। কোন মতে সকালের জরুরী কাজগুলো শেষ করে, ছুটি করে নিয়ে, সাইকেল চেপে সোজা দাঁতের ডাক্তারের বাড়ি। নিতান্ত অসময়, অনেকক্ষণ বসে বসে কষ্ট পেয়ে, শেষে পোকা খাওয়া দাঁতটি তুলিয়ে, কিঞ্চিৎ পয়সা জলাঞ্জলি দিয়ে, সিঁড়ির তলা থেকে সাইকেলটা নিয়ে, ডাক্তারের বাড়ির দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

কপাল দিয়ে, ঘাড় দিয়ে ঠাণ্ডা ঘাম গলা বেয়ে নামতে লাগল। তাতে আর বিচিত্র কি? সকাল থেকে শরীর মনের উপর দিয়ে যে ধকল গিয়েছে, ঘাম মুছবেন বলে রুমালটা বের করতেই টুপ করে লাল রঙের ছোট্ট একটা ঘুঁটি পায়ের কাছে পড়ল। ঝেটিয়ে ফেলার সময় এটা বোধ হয় রুমালে আটকে গেছিল।

সেটি তুলে নিলেন হরিদাসবাবু। হাসি পেল। এই সেই হত-ভাগার মৃতসঞ্জীবনী ঘুঁটি। ঠিক সেই সময়ে ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটে গেল। ঘুঁটি তখনো তাঁর হাতে ধরা। ছোট্ট একটা খেলার স্কুটারের ওপর চেপে ছুটো ছ-সাত বছরের ছেলে পাগলের মতো বোঁ বোঁ করে ছুটে এসে হরিদাসবাবুর সাইকেলে ধাক্কা খেল। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে দাঁড়ানো ছেলেটা ছিটকে রাস্তায় পড়ল, একেবারে একটা গাড়ির

চাকার সামনে।

হয়তো চাকাটা তার গায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়নি, ধাক্কা লেগেছিল শুধু। কিন্তু তার গলাটা যে ফুটপাথের কিনারায় বিশ্রী একটা ঘ্যাশ শব্দ করে পড়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ঐ বাড়িতে অনেক ডাক্তারের চেম্বার ছিল। নিচের তলার ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাক্তার ছুটে এসে, ছেলেটার পাশে বসে পড়ে একটু দেখেই বললেন, "কিছু করবার নেই। সব শেষ।"

ততক্ষণ চারদিকে ভিড় দাঁড়িয়ে গেছে। পুলিশের লোকও যে কোত্থেকে উদয় হয়েছে, তার ঠিক নেই। এতক্ষণে হরিদাসবাবুর হুঁশ হল! কাউকে কিছু না বলে, হাঁটু গেড়ে ছেলেটার পাশে বসে, তার রগের ওপর লাল ঘুঁটি কাপড় দিয়ে চেপে ধরলেন। শীতের সময়, এরি মধ্যে আলো কমে এসেছিলো, ভালো করে সব কিছু ঠাওর হচ্ছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে ছেলেটা যে হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল, হরিদাসবাবু সেটা স্পষ্ট টের পেলেন। ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সে নড়েচড়ে উঠতেই, চমকে গিয়ে আবার বসে পড়লেন।

আরে, আরে, একি! লাইফ রয়েছে যে! ওহে তোমরা সর, সর, একটু জায়গা দাও, একটু হাওয়া লাগুক। সেই গোলমালের মধ্যে হরিদাসবাবুর হাত থেকে ঘুঁটিটা ছিটকে নর্দমার গ্রিলের মধ্যে দিয়ে পড়ে গেল। হরিদাসবাবুর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হয়েছিল বাড়িতে। নাকি যে অ্যাম্বুলেন্সে ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ওঁকেও তাতে করেই পৌঁছে দিয়েছিল। ছেলেটির শরীর নাকি একটু-ও জখম হয়নি। খালি রগে একটা ছোট্ট গোল দাগ দেখা গেছিল। সেটাও একটু পরেই মিলিয়ে গেছিল।

হরিদাসবাবু শেষ বারের মতো তু-ঢোক জল খেয়ে দেখলেন পূর্ব দিকের আকাশ ফিকে হয়ে এসেছে। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আপিসে গিয়ে, আবার তাঁকে নিজের জায়গায় বসতে হবে। কিন্তু তিনি মনে মনে নিশ্চিত জানতেন যে সেই খেমো লোকটি আর কখনো আসবে না। আসেওনি।

———

গুণিন

খরার দেশের কোপাই নদী। পূজোর কিছু দিন পর থেকে ঝিরঝির করে বয়। শীতকালে টলটলে জলে মাছরা খেলা করে। গ্রীষ্মকালে কোথায় নদী, কোথায় মাছ, কোথায় বা কি! সরু একটা নালা বালির ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যায়, মাঝে মাঝে বালির নিচে তলিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

বৃষ্টি পড়লে ওই নদী দেখতে হয়! ফুলে ফেঁপে ফুঁশে গর্জে পাড়ি কাঁপিয়ে ছুটতে থাকে। গরু ছাগল মানুষজন তার মধ্যে পড়লেই তো হয়ে গেল! জল না নামা অবধি এ পারের লোকে এই তীরে বসে থাকে, ওপারের লোক ওই তীরে।

কোনাই নদীর এই তীরে মৌবনি গাঁ। অন্য তীরে দুখু পণ্ডিতের পাঠশালা। পাঠশালার পিছনে বটগাছি গাঁ। দুই গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা পাঠশালায় পড়ে, তা ত্রিশ-চল্লিশজন তো বটে। পাঠশালা আজকাল গমগম করে। দুখুর মা গরু কিনেছে।

চার বছর আগেও এমন ছিল না। সবাই বলত, ও মা! ছেলে-মেয়ে পাঠাব কি, পণ্ডিতমশাই? সংসারের ফাই-ফরমায়েস খাটে ওরা, ছাগল চরায়, ভিক্ষে করে দু-পয়সা ঘরে আনে। তোমার ঐ অং-বং শিখে কি লাভটা হবে শুনি? ওরা কি বোলপুর ইস্কুলের মাস্টার হবে?

পণ্ডিতের ঘরে হাঁড়ি না চড়ার হাল হয়েছিল। তারপর তার দিন ফিরল। সরকার থেকে মাটির ঘরটি মেরামত করে দিল। পণ্ডিতের মাস-মাইনে হল। ছোট পণ্ডিত এল। আরেকটা মাটির ঘর হল। মিনি-মাগনায় বই আর কাঠের শেলেটের ব্যবস্থা হল। কিছু ছেলে-মেয়ে এল। পড়ার পর সকলের জন্য পেট ভরে খিচুড়ি আর কুমড়ো ঘণ্ট আর একটা করে ইজেরের বন্দোবস্ত হল। তখন দুই গ্রামের সব ছেলে-মেয়ে পাঠশালায় ভিড় করে এল।

তাদের মধ্যে ছিল মৌবনির কানু আর উদো। তাদের বাবারা বোলপুরে মালির কাজ করে। বুড়ো বয়সে কিছু কিছু লিখতে পড়তে শিখেছে। ছেলে দুটো বড়ই নারাজ। গাছ থেকে পেড়ে, কান ধরে বাপরা তাদের পণ্ডিতের কাছে সঁপে দিয়ে এল। সারা রাস্তা ডুকরে কেঁদে গলা দিয়ে তাদের স্বর বেরোয় না।

বাপরা চলে গেলে দুখু পণ্ডিত তাদের এলুমিনিয়মের গেলাসে জল আর একটা করে লাল বাতাসা দিতে তবে কান্না থামল। লেখা-পড়াও শুরু হল। যেমন পড়ুয়া লেখা-পড়াও তেমনি। বই ছিঁড়ে, কাঠের শেলেটের কিছু করতে না পেয়ে, খড়িগুলো গুঁড়িয়ে অন্যদের মুখে মাখিয়ে, দুই পোড়ো অনাছিষ্টি কাণ্ড লাগাল। পড়ার শেষে গরম খিচুড়ি আর ঘ্যাটের আশা না থাকলে, কোন কালে তারা পগার পার হত, তার ঠিক কি!

দুখু পণ্ডিত সব দেখলেন, সব বুঝলেন। একবার ভাবলেন দিই দুটোর খিচুড়ি ভোগ বন্ধ করে। আবার তাদের প্যাঁকাটির মতো হাত-পার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, আহা পেট ভরে খাক। না-খাওয়ার দুঃখ আমি জানব না তো কে জানবে!' ফলে দুষ্টুমি বেড়েই চলে।

এর মধ্যে একদিন আকাশ কালো করে মুষল-ধারে বৃষ্টি নামল। দেখতে দেখতে নদী তো নয় যেন পাগলা হাতির পাল। সকলের চক্ষুস্থির। তারি মধ্যে খিচুড়ি আর আলুর দম খাওয়া হল। বটগাছির পোড়োরা ভিজতে ভিজতে কোলাহল করতে করতে যে যার বাড়ি গেল। মৌবনির ছেলেমেয়েদেরো অনেকের-ই এ-পারে মাসি-পিসির বাস। তারা সেখানে ছুটল।

বাকি রইল কানু উদো, আরো কে কে, সর্বসাকুল্যে সাত আটজন। দুখু পণ্ডিত চেয়ে দেখেন সব সমান রুক্ষ চুল, চকচকে চোখ, হাত-পাগুলো কেবলি নড়ছে-চড়ছে, হেলছে দুলছে। এমনি সময় ছাতা মাথায় পণ্ডিতের বন্ধু দুলু ওস্তাদ এসে হাজির। এসেই বলে কি না।

'হ্যাঁরে বই ছিঁড়িস্ কেন ? ছবিগুলো কি জ্যান্ত নয় ?' শুনে ওরা হাঁ ! হুলু বলল, 'আগে বটগাছিতে গাঁ ছিল না, ছিল খালি দু-কোশ জায়গা জুড়ে বটগাছের বন। লোকে বলত ভূত-প্রেতের আড্ডা। দিনের বেলাতেও যেত না। সেইখানে পালালাম আমরা পাঁচজনা। বোলপুর ইস্কুলের মাস্টার ঠেঙিয়ে, প্রাণের দায়ে ভূতের ভয় ভুলে। দিনের বেলাতেই আধা অন্ধকার, সন্ধ্যা লাগতে ঘুট্ ঘুটে। বুঝতেই পারছিস্, পথ হারালাম। অমনি আমাদের আঁধিতে ধরল। আঁধি কি জানিস্ ?

আলি বলল, 'ধূলোর ঝড়। মামাবাড়ির গাঁয়ে হয়।' হুলু বলল, 'সে হলে তো ভালো ছিল। এ অন্য আঁধি, এ বড় ভয়ানক ! মনের মধ্যে ভুল লাগায়। একটা বটের বড় গুঁড়িতে আধখানা থালার
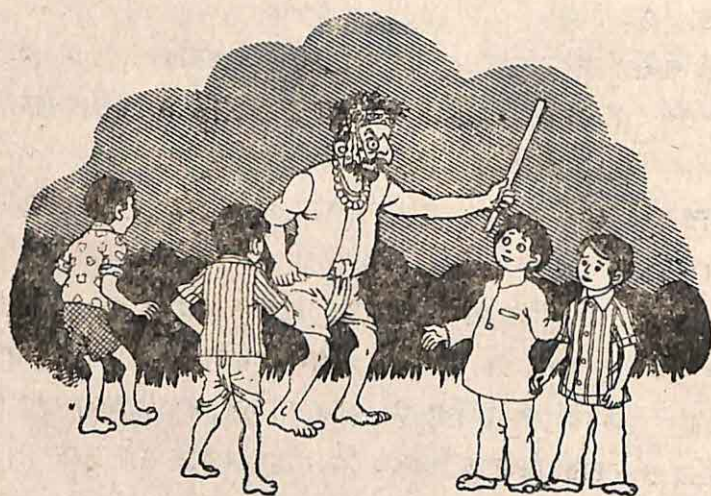
মতো বড় ব্যাঙের ছাতা, সেইখান থেকে ছুটতে লাগলাম, হাত ধরাধরি করে। ভাবলাম সোজা ছুটলে বনের শেষ পাবই। আধ ঘণ্টা বাদে চেয়ে দেখি আবার সেই আধখানা থালার মতো ব্যাঙের ছাতা-ওয়ালা বটগাছের গুঁড়ির সামনে পৌঁছেছি !

'তখন আলি, ভুলি, বুদো, বোঁচা আর আমি চ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠলাম। যেই কান্না বনের মধ্যে হুয়া—হুয়া করে ফিরতে লাগল।

অমনি ঝুরির জঙ্গল ফাঁক করে পৌষ মেলার মাঠে দেখা বড় গুণিন বেরিয়ে এল। সবাই বলত গুণিন জাদু জানে, ভূত বশ করে, মানুষকে গিরগিটি করে দেয়। গুণিনের পায়ে পড়ে কেঁদে বললাম, "আঁধি লেগেছে মনে। পথ পাচ্ছিনে।" গুণিন কাষ্ঠ হাসল, "তা লাগবে না, আকাট মুখ্যু সব! এবার বই ছিঁড়ে, ম্যাস্টর ঠেঙিয়ে, লম্বা দেওয়ার মজা বোঝ্। বলি, বইয়ের পাতা ছিঁড়লি যে, লেখাগুলোর কি প্রাণ নেই? আগে জবাব দে, পরে পথ।" এই বলে সাপমুখো লাঠি দিয়ে নিজের চারদিকে দাগ কেটে দিয়ে পুরনো উইঢিপির ওপর বসে, লাঠিটে সামনে পুঁতে দিল। অমনি সাপমুখো হাতল থেকে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। আমরা ভয়ে মরি। তখন ঝোলা থেকে আমার ছেঁড়া বইটে বের করে বলল, "বলি, এর কি প্রাণ নেই?" বুদো বড় বেপরোয়া, সে বলল, "কাগজের ওপর কালির আঁকিবুঁকি। ওর ধড়ও নেই, প্রাণও নেই।"

"নেই বুঝি? তা আঁকিবুঁকি বলেটা কি?" বুদো বলল, "বলে বন বিড়াল, বাঘ।" গুণিন বলল, "তাদের ধড় নেই বুঝি?" এই বলে পাতা উল্টে দেখাল। ওপরে ব দিয়ে বন বিড়ালের ছবি, নিচে বাঘের ছবি। গুণিন বলল, "নাকি খালি আঁকিবুঁকি, ধড়ে প্রাণ নেই?" এই বলে দু হাতের দশ আঙুল দিয়ে ছেঁড়া পাতা থেকে ছবি দুটোকে অমনি তুলে সামনে ছেড়ে দিল। তাদের গায়েও ছেঁড়ার দাগ। তারা তখন এই বড় বড় নখ বের করে আমাদের ধরবার জন্য হাঁচড়-পাঁচড় করতে লাগল। কিন্তু গুণিনের দাগ ডিঙিয়ে বেরোতে পারল না। আমরা ভয়ে কাঠ। পালাবারো জো নেই। তারপর ছেঁড়া বই বন্ধ করতেই বাঘ-বন-বিড়াল শূন্যে মিলিয়ে গেল। গুণিন বই বন্ধ করল! দাগের জাদু ফুরিয়ে গেল। কিন্তু লাঠিটা মশালের মতো চারদিক আলো করে জ্বলতে লাগল। সেই আলোতে আমরা বট বন থেকে বেরুবার পথ পষ্ট দেখতে পেলাম। গুণিন বলল, "তাহলেই দেখছিস্ ঐ আঁকিবুঁকিতেই দুনিয়ার সব বিদ্যে পোরা থাকে। সেই বই ছিঁড়িস্ তোরা, ছিঃ!"

এই বলে ঢুলু ওস্তাদ উঠে পড়ল। কখন বৃষ্টি ধরে গেছে, কোপাই নদীর জল শান্ত হয়েছে, ওরা কিছুই টের পায়নি। ঢুলু বলল, 'চল্ তোদের পোঁছে দিই।'

কানু উদো দুখু পণ্ডিতের পায়ে পড়ে বলল, 'এবারটি মাপ কর পণ্ডিতমশাই। কাল আঠা দিয়ে পাতা জুড়ে বই নিয়ে আসব দেখো।'

ঢুলিয়া

দইওয়ালাতে যখন গাড়ি দাঁড়াল, তখন ভোর হয়ে এসেছে। সে কি ভোর। সচরাচর অমন দেখা যায় না। দূরে যেখানে আকাশেতে মাটিতে মিশে গেছে, সেখানে জলের রেখার মতো চিকচিকে একটি সাদা রেখা। খুব সকালে যারা ওঠে, তারা ভিজে ঘুঁটে দিয়ে উনুন ধরাচ্ছে, স্যাতসেঁতে কাঠ জ্বালাচ্ছে। সে ধোঁয়া আকাশে না উঠে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাইছে। ধরা-মা'র গরম কাঁথা নরম আর আরাম ছেড়ে নড়তে চাইছে না। খড়ের চালগুলোও ঝুলে পড়ে মাটি থেকে বেশি দূরে নেই। গাছপালাও কুয়াশা মেখে মেঘের ডেলা হয়ে আছে। বন্ধ দরজা-জানলার পেছনে আশী বছরের বুড়ো ঠাকুরদাদের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সমস্ত আকাশ যেন মিহি সাদা মেঘের ওড়না জড়িয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে নীল রংটি বড় কোমল হয়ে দেখা দিচ্ছে। চারদিক থেকে গোরু মহিষের ডাক শোনা যাচ্ছে। মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে; সারা-জীবন যা খুঁজেছি কিন্তু পাইনি, সে কি তবে এইখানে?

আপাদমস্তক রঙ-বেরঙের তালি দিয়ে তৈরি করা মোটা কাঁথা জড়িয়ে মাথার ওপর তিনটি ঝকঝকে পেতলের হাঁড়ি বসিয়ে, একজন সত্তর বছরের বুড়ি গাড়িতে উঠল। তার পেছন পেছন একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েও পাহাড়ে নদীর মতো কলকল করতে করতে উঠে পড়ল। নিজের পাশে হাঁড়ি নামিয়ে বেঞ্চির ওপর বুড়ি বসল। সবচেয়ে

নিচে বড় হাঁড়ি, তার মুখে বসানো মাঝারি হাঁড়ি, সবার ওপরে সব-চেয়ে ছোট হাঁড়ি। ঘন দুধে ভরা হাঁড়ির মুখে এক মুঠো সোনালী খড় ভাসছে। ঘরময় কি একটা মিষ্টি গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ, মহুয়ার গন্ধ, মধুর গন্ধ সব ভালো গন্ধের পরম সুগন্ধ হয়ে ভুরভুর করতে লাগল।

ছেলেমেয়েগুলো বুড়ির হাঁটুর চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে, বসল, কেউ বা মাটিতে, কেউ বা বেঞ্চির কিনারে, কেউ বা হাঁটু গেড়ে, আবার কেউ রইল দাঁড়িয়ে। কালো চুলে তাদের তেল পড়েনি চিরুনি পড়েনি, কালো চোখের চারধারে কাজলের কালোর বদলে একটু লালচে আভাস, যেন এইমাত্র চোখ রগড়ে ঘুম থেকে উঠে বসেছে। হাত-পাগুলো তাদের কেবলি নড়েচড়ে, এই খোলে এই বন্ধ হয়।

তারা সবাই মিলে বুড়ির কোলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, "কার জন্য এত দুধ নিয়ে যাচ্ছ তুমি? আমাদের একটু দেবে না?"

বুড়ির কোটরে বসা চকচকে চোখের কোণায় বয়সের ইকড়ি-বিকড়ি দাগ পড়েছে, কতক দাঁত আছে, কতক নেই। বুড়ির মুখ হাসিতে ছল-ছলিয়ে উঠল, "ওরে ও দুধে নজর দিস নে, ও দুধ যে আমার দাদামশাই খাবে।"

তারা বললে, "তা কেন? অত দুধ তোমার দাদামশাই খাবে কেন?"

বুড়ি বললে, "ওমা, তা খাবে না? যখন ছোট ছিলাম, দাদাম-শায়ের কাছে মা আমাকে জিম্মা করে দিয়ে কাজে যেত আর আমি অমনি এই আতাগাছের মগডালে চড়ি, এই পুকুরপারে দৌড় দিই। দাদামশায় হঁাচড়-পাঁচড় করে পেছন পেছন ছোটে, এই আমাকে ধরে ফেলে বলে, অমনি আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে, ছু-উ-উ বলে কানে তালা লাগিয়ে ছুট—ছুট্—ছুট্। হাঁপিয়ে হদ্দ হয়ে যেত বুড়ো, হাত জোড় করে বলত, লক্ষ্মী দিদি তোর পায়ে পড়ি, একটুখানি স্থির হয়ে বস্, আমি তোকে বাঁশি শোনাই। অমনি আমিও ভালোমানুষের মতো তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

তখন পিরানের ভেতর থেকে দাদামশায় বাঁশের বাঁশি বের করে, তার গায়ে হাত বুলোত, ধুতির খুঁট দিয়ে ঘষত মুছত, তারপর মুখে তুলত। অমনি বুড়োর কাশি থেমে যেত, হাঁপানি সেরে যেত, সে কি সুর রে, তোদের কাছে আর কি করে বলি। শুনতে শুনতে প্রাণটা আমার কানায় কানায় ভরে যেত ; বাজাতে বাজাতে দাদামশায়ের গলা শুকিয়ে যেত ; তার হাটুতে মাথা রেখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম টের পেতাম না। শুকনো গলাটা ভেজাবার জন্য তখন তাকে দুধ দিইনি, জল দিইনি ; তাই দাদামশায়ের জন্য আজ কলসি ভরে দুধ নিয়ে যাচ্ছি।"

তাই শুনে ছেলেমেয়েগুলো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে, "আমরা তোমার সেই দাদামশাই ; কই, দাও, আমাদের মুখে দুধ দাও।" বলে, বুড়ির কোলে থুতনি রেখে, ছোট ছোট হাঁ করলে। বুড়িও ছোট ঘড়ার সব দুধটুকু তাদের গালে একটু একটু করে ঢেলে দিয়ে, পা গুটিয়ে বাবু হয়ে বসল।

তখন ছেলেমেয়েগুলো উঠে পড়ে রুক্ষ-রুক্ষ চুলগুলোকে ঝেড়ে, মাঝের ঘড়াটাকে দেখিয়ে বলল, "ও হাঁড়ির দুধ কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ ?

ও-দুধটি আমাদের দাও।"

বুড়ি বললে, "তা কি করে হয় ? ও দুধ তো আমার বাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।"

তারা অবাক হয়ে বললে, "কেন, বাবার জন্য অত দুধ কেন ?"

বুড়ি বললে, "ও মা, ওটুকুও নেব না। গ্রীষ্মকালে খরা লাগলে আমাদের গাঁয়ে একফোঁটা জল পাওয়া যেত না। পুকুর শুকিয়ে তলায় ফাটল ধরত। কুয়ো শুকিয়ে কাদা উঠত, সেই কাদা চুষে জন্তু-জানোয়ার খোঁড়া মানুষ বাঁচত। আমার মা-বাবা আমাকে নিয়ে দু কোশ হেঁটে ঝরনার জল আনত।

যাবার সময় জলের লোভে দৌড়ে দৌড়ে আগে আগে যেতাম। তখন ভোর-ভোর, মাথার ওপর সূয্যির তেজ নেই, মনের খুশিতে চলে

যেতাম। সেখানে পাথরের গা বেয়ে সাদা ফেনায় ভরা জল নামত, আমরা আশ মিটিয়ে জল খেতাম, গায়ে মাথায় জল ঢালতাম। তারপর এই রকম জলভরা কলসির মুখে কলসি বসিয়ে মা মাথায় তুলে নিত। বাবা ভিজে গামছা মাথায় চাপিয়ে, মশক ভরে জল নিত। ফেরার পথে আমি খালি খালি পেছিয়ে পড়তাম। ক্রমে মাথার ওপর সূয্যির তেজ বাড়ত, কোথাও ছায়া সেই, মেঘ নেই ; চোখে অন্ধকার দেখতাম, হাঁটু মুড়ে পড়ে যেতাম।

বাবা তখন ভিজে গামছা দিয়ে, আমার চোখ মুখ মুছিয়ে, আমার মাথায় গামছাটা জড়িয়ে দিয়ে, আমাকে কাঁধে চাপিয়ে বাড়ি নিয়ে আসত। শুনতে পেতাম হাপরের মতো বাবার বুক উঠছে পড়ছে, খ্যাস খ্যাস করে বাবার নিশ্বাস পড়ছে। তখন তো বাবাকে জল দিইনি, দুধ দিইনি, তাই আজ বাবার জন্য ঘড়া ভরা দুধ নিয়ে যাচ্ছি।"

তাই শুনে ছেলেমেয়েগুলো আবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, বুড়ির হাঁটুতে থুতনি রেখে বললে, "আমরা তোমার সেই বাবা। দাও, আমাদের মুখে দুধ দাও।" এই বলে ছোট ছোট হাঁ করলে। বুড়ি তখন মাঝারি ঘড়া থেকে তাদের মুখে বেশি বেশি করে দুধ ঢেলে ঘড়া খালি করে নামিয়ে রেখে নড়েচড়ে বসল।

তখন ছেলেমেয়েরা সবার নিচের সবচেয়ে বড় ঘড়া দেখিয়ে বলল "ও দুধ তুমি কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ, ও দুধ আমাদের দাও।"

বুড়ি বললে, "তা কি করে দিই? ও দুধ যে আমার স্বামীর, আমার দেওরদের আর ছেলেদের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। ও দুধ তোদের কি করে দিই?"

তারা বললে, "কেন, ওদের জন্য অত দুধ নিয়ে যাচ্ছ কেন?"

বুড়ি ফোকলা দাঁত বের করে বলল, "তা নেব না? আমাদের খেতের ফসল কারা ফলিয়েছে? কারা গাই বলদ চরিয়েছে? রাতে কারা মশাল জ্বেলে ভালুক তাড়িয়ে মৌচাক বাঁচিয়েছে? দিন নেই, রাত নেই, খিদে নেই, তেষ্টা নেই, খাল কেটে বাঁধ দিয়ে জল আনত

তারা। দুপুরবেলা চারটি খেয়ে আবার গিয়ে লাঙল ধরত, মাঠে মাঠে গরু আগলাত। আজন্মার বছর আমাদের খোকাখুকুদের মুখে এক মুঠো গম দেবার জন্য প্রাণে শুকিয়ে মরত তারা। তখন তো তাদের গাল ভরে দুধ দিতে পারিনি, তাই আজ তাদের জন্য ঘড়াভরে দুধ নিয়ে যাচ্ছি।"

ছেলেমেয়েগুলো অমনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বুড়ির কোলে থুতনি রেখে, ছোট ছোট হাঁ করে বললে, "আমরা তোমার সেই স্বামী, সেই দেওর, সেই ছেলে, দাও, আমাদের মুখে দুধ দাও।"

বুড়ি তখন তাদের গালে অনেকখানি করে দুধ ঢেলে, অর্ধেক কলসি খালি করে, নামিয়ে রাখল। ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে ঘড়া দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ও দুধ তবে কার জন্য রাখলে?"

বুড়ি ছলবলিয়ে হেসে বলল, "ওটুকু আমার নাতি-নাতনীদের জন্য।"

তারা বলল, "কেন, তাদের জন্য কেন? তারা করেছেটা কি?"

বুড়ি বলল, "না দিয়ে করি কি? তারা যে খালি বলে দাও, আমাদের দাও, আমাদের মুখে দুধ ঢেলে দাও।"

ছেলেমেয়েগুলো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, বুড়ির হাঁটুতে থুতনি রেখে বলল, "আমরা সবাই তো তোমার নাতি-নাতনী, দাও,আমাদের দুধ দাও।" বলে ছোট ছোট হাঁ করলে। বুড়ি তখন চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে বাকি দুধটুকুর সবখানি তাদের গালে ঢেলে দিয়ে, উঠে পড়ল। গাড়িও ঠিক সেই সময় হুলিয়া স্টেশনে পৌঁছে গেল আর তারা সবাই কলকল করতে করতে, শূন্য কলসিতে চাপড় দিয়ে বাজাতে বাজাতে বুড়ির সঙ্গে নেমে গেল।

শব্দ

ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়ে কিছু দূর গেলে যে চিংড়িখালি বলে একটা জায়গায় পৌঁছানো যায়, এ-কথা অনেকেই জানে না। অথচ

দুশো বছর আগে ঐ জায়গার নামে এ অঞ্চলের লোকে ভয়ে কাঁপত, কারণ ঐখানে ছিল কুখ্যাত বোম্বেটেদের একটা বড় আস্তানা। এখনো মাটি খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ মড়ার খুলি কিংবা রুপোর বাসন বের করে চাষীরা আঁতকে ওঠে।

আমি অবিশ্যি এসব নিজে দেখিনি; আমার পিসতুতো ভাই সাবুর দাদুর বাড়ি ওখানে, আমার সঙ্গে চিংড়িখালির এইটুকুই সম্বন্ধ। সেবার পূজোর ছুটিতে গেছিলাম ওখানে। গ্রাম বলতে বিশেষ কিছু নেই, খান-দুই পুরনো পাকা বাড়ি, খানকতক টিনের চালের ঘর, একটা প্রাইমারি স্কুল, একটা পর্তুগীজ গির্জা, কাছেই নদীর ধারে জেলেদের গ্রাম, কয়েকটা দোকান, একটা কালী-মন্দির। সেখানে বোম্বেটেরা ফিরিঙ্গি কালীর পূজো দিত, জেলেরা এখনো দেয়। মন্দিরের চাবি থাকে গির্জার পাদ্রীর কাছে। সাবুর দাদুদের কুলপুরোহিত রোজ দুবেলা পূজো দিয়ে আসেন। বেশ রোমাঞ্চকর জায়গাটা।

গঙ্গা ওখানে দু'মাইল চওড়া, ওপার দেখা যায় না। জোয়ারের সময় মনে হয় বুঝি গোটা বঙ্গোপসাগর নদীর মুখে ঢুকে পড়েছে। হাওয়া দিলে অদ্ভুত গুপ-গুপ শব্দ হয়। হাঙরের ভয়ে কেউ জলে নেমে স্নান করে না। আমি নিজেই কতবার দেখেছি হাঙরদের তেকোণা পাখনা জলের ওপর ভেসে রয়েছে।

নদীর তীর ধরে আরেকটু দক্ষিণে গেলে মনে হয় বুঝি কোনো জনমানবশূন্য সাগরের দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। সেখানে উঁচু পাড়ি, বসতির চিহ্ন নেই; চাষ হয় না, মাটি বড় নোনা। সন্ধ্যাবেলায় সাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে ওখানে একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। নদীটা সেখানে একটা বাঁক নিয়েছে, স্রোতের সে কি বেগ! পাড়িটা পাথুরে, তার ওপর ছলাৎ ছলাৎ করে জল আছড়ে পড়ছে, তারপর ফেনা ছিটিয়ে কলকল করে ছুটে যাচ্ছে।

ডুবন্ত সূর্যের আলোতে হঠাৎ মনে হল নদীর ঢেউয়ের বুকে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই মাথা তুলে রয়েছে, তারই মধ্যে যেন

একটা কালো পাথরের প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। সেটা চারপাশের সঙ্গে এমনি মিলিয়ে আছে যে হঠাৎ ঠাত্তর হয় না। ঠিক প্রাসাদ হয়তো নয়, তবে চারদিকে উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা একটা কেল্লা বটে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে জলের শব্দ ঠিক কানে আসছিল না, শুধু একটা মিহি গুম-গুম ক্যাও-ক্যাও মনে হচ্ছিল।

সাবু বলল, "অত অবাক হবার কি আছে? ঐ তো বোম্বেটেদের কেল্লা। উত্তরাধিকারসূত্রে দাদুদের ওটা পাওয়া উচিত। আমরা বোম্বেটেদের বংশধর।"

"কে থাকে ওখানে? একটা আলো জ্বলে উঠল যে?"

"থাকে এক পাগলা প্রফেসার। গোপনে গবেষণা করে। আর থাকে তার অ্যাসিস্টেণ্ট। ভূতের ভয়ে স্থানীয় লোকেরা ওদিক মাড়ায় না। চল, জায়গাটা সত্যি ভালো না? এত দূর এসেছি জানলে দাদু রেগে যাবেন। এখানকার লোকেরা নাকি অনেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে—ও কি!"

খ্যা—খ্যা—খ্যা—খ্যা করে কে জানি বিকট হেসে উঠল। দেখি লালচে মুখ, রোগা লম্বা একটা লোক, তার খাড়া খাড়া কাঁচা—পাকা চুল, পরনে জাহাজের সারেঙদের মতো ঢিলে নীল কুর্তা পাজামা, কখন নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

সাবু আমার সার্ট ধরে টেনে বলল, "বাড়ি চল।"

লোকটা বলল, "সে কি, মজা না দেখেই চলে যাবেন? ঐ যে পাগলা প্রফেসার যন্ত্রপাতি সওদা করে ফিরছেন, দেখে যাবেন না? কেউ ওঁকে দেখতে পায় না"

আমি বললাম, "কিসের যন্ত্রপাতি? কি হয় ওখানে?"

লোকটা উঠে পড়ে বলল, "কি জানি, মুখ্যু মানুষ। শুনেছি শব্দ ধরার যন্ত্র।" এই বলে টুপ করে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম দূরে একটা কালো নৌকো খোলামকুচির মতো ঢেউয়ের মাথায় উঠছে পড়ছে। চারদিক থমথম করছে। আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ি ফিরলাম।

জায়গাটা গল্পের বইয়ের জায়গার মতো। রাতে সমুদ্রের কচ্ছপের মাংস হয়েছিল। মাখনের মতো নরম। ওখানকার হাটে প্রকাণ্ড গুগলী বিক্রি হয়। অদ্ভুত চেহারার মাছ কেনে লোকে। এক রকম মাছের আবার মাথার একই পাশে দুটো চোখ, অন্য পাশটা চাঁচা-পোঁছা। পাথরের ফাটল থেকে জেলেদের ছেলেরা এই বড় বড় নীল চিংড়ি, কালো কাঁকড়া টেনে বের করে, বিক্রি করতে আসে। রুই কাতলাকে ওরা বলে নিরামিষ।

সাবুর দাদু এ-সব কথা বলেছিলেন আমাদের। ওখানে ওঁদের চোদ্দ পুরুষের বাস। ও জায়গা সম্বন্ধে জানেন না এমন কিছু নেই। দুঃখের বিষয়, বোম্বেটের কেল্লা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা গেল না, কারণ ওদিকে আমাদের যাবার কথা নয়।

কিন্তু জায়গাটা আমাদের চুম্বকের মতো টানত। রোজ যাওয়া ধরলাম। ক্রমে সাহস বাড়তে লাগল। পাড়ির ওপরের পথে না থেকে, পাথরের খাঁজে পা রেখে একটু একটু করে নিচের দিকে নামা ধরলাম। যতই নামি ততই কেল্লাটাকে স্পষ্ট করে দেখা যেতে লাগল। নিরেট পাথরে তৈরী, চারদিকে দোতলার সমান উঁচু দেয়াল, দেয়ালের গায়ে ছ্যাঁদা। তার ভিতর দিয়ে বোম্বেটেরা শত্রুদের গুলি করত। পাঁচিলের গায়ে লোহার দরজা। বাইরে গভীর খাল কাটা। এক দিক দিয়ে তার মধ্যে নদীর জল হুড় হুড় করে ঢুকছে, আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পার হবার জন্য পুল আছে, সেটাকে লোহার শেকল দিয়ে টেনে কপিকলের সাহায্যে তুলে রাখা হয়েছে। সামনের দিকটাতে নদী। ব্যাস্, কেল্লাটি যেন উদ্দাম জল-বেষ্টিত একটা দ্বীপ। দেখলে গা শিরশির করে।

নামতে নামতে সাত দিনের দিন কেল্লার পাথরের পাদদেশে পৌঁছে গেলাম। পাথরের খাঁজে অদ্ভুত পাখির বাসা দেখলাম। তারা আমাদের দেখে, মহা ক্যাঁও ক্যাঁও লাগাল।

পায়ের নিচে পাথর বড় পিছল। সামনে উত্তাল জলের স্রোত। বুক ঢিপঢিপ করছিল। সন্ধ্যা হয়েছে, এখন ফেরা উচিত। ফিরতে

যাব, এমন সময় পেছনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দুটো লোক আমাদের কনুই চেপে, হাতদুটোকে পেছনে পাছ-মোড়া করে ধরল। আমি আঁ আঁ করে যাই আর কি! সাবু বলল, "কি! কি! আমরা তো শুধু দেখছি, কোনো অনিষ্ট করছি না। ভালো করে দেখতেও পাচ্ছি না।

বেঁটে জন কাষ্ঠ হেসে বলল, "সেই ভালো গোমেজ, ভেতরে এনে ভালো করে দেখিয়ে দেওয়া যাক।"

গোমেজ বলল, "শুনিয়ে দেওয়া যাক, বলুন। কি খোকারা, বলিনি স্যার শব্দ ধরেন?"

এই তবে সেই পাগল বৈজ্ঞানিক। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "আঃ গোমেজ! যার তার কাছে আমাদের গোপন গবেষণার কথা বলে বেড়াও কেন বল তো? সে যাক গে, সে আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম। আজ আমার মন বড় ভালো। এত দিনের চেষ্টা সফল হবার মুখে! ভালোই হয়েছে তোমরা এসেছ। তোমরা বড় ভাগ্যবান, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদানের নমুনা সবার আগে তোমরা শুনতে পাবে? ও কি, চোখ পিটপিট করছ কেয, গোমেজ, নিয়ে চল।"

"চোখ বাঁধব, স্যার?"

"আরে না না, আর গোপনীয়তার দরকার নেই। চল।"

দেখলাম হাঙর ভরা পরিখার তলায় গোপন সুড়ঙ্গ পথ আছে। তাই দিয়ে ঢুকে আমরা কেল্লার হলঘরে উঠলাম। অদ্ভুত জায়গা। পাথরে তৈরী, মনে হল কামান দাগলেও টসকাবে না। সেখান থেকে যে ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসাল, সেটা একটা আধুনিক গবেষণাগার ছাড়া আর কিছু নয়। রেডিও, রেকর্ডার, গ্রামোফোনের মতো সব যন্ত্রপাতি। তাকের ওপর বড় বড় সমুদ্রের শাঁখ, বাজনা-বাদ্যি, বাঁশি, খোল, করতাল।

পাগল বৈজ্ঞানিক বললেন, "অবাক হবার কিছু নেই। শব্দ নিয়ে গবেষণা করি, শব্দ তৈরির জিনিস থাকবে না? এ আর কি দেখছ?

কত মোরগ, ছ্যাতারে, বেড়াল, ইঁদুর, ছুঁচো, উল্লুক, কোলাব্যাঙ ইত্যাদি আছে আমার সাউণ্ড-প্রুফ ঘরে। নইলে ক্ষেপে যাব। ওদের গলার স্বর, পাখার ঝাপটানি মহাশূন্যে অনন্তকাল ধরে তরঙ্গায়িত হবে, ভাবলেও রোমাঞ্চ হয় না ? কি গোমেজ ?”

গোমেজ প্রফেসারের কোঁকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল, “শব্দ-তরঙ্গের মূল কথা বুঝিয়ে না দিলে কিছুই ওদের বোধগম্য হবে না, স্যার !”

প্রফেসার বসে পড়লেন। দেখলাম মোটা, বেঁটে, কালো, লোমশ,
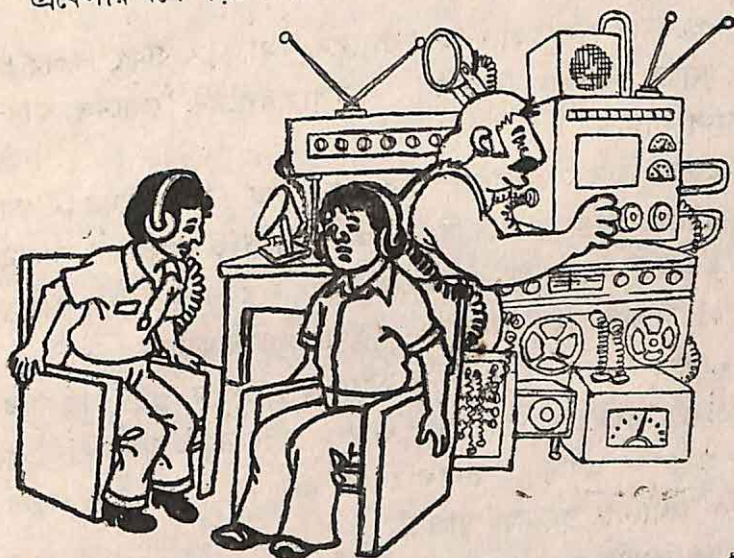
খ্যাঁদা নাক, সাবুর দাতুর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য। পায়ে রবারের চটি, বোধ হয় যাতে অনন্তকাল শব্দ না হয়।

প্রফেসার বললেন, “এটুকু নিশ্চয় জান যে শব্দ হলেই তরঙ্গ ওঠে ? মানে তরঙ্গ না উঠলে শব্দই, হয় না ? সেই তরঙ্গগুলো যায় কোথায় ?

আমরা বললাম, “থেমে যায়, স্যার, আর শোনা যায় না।”

প্রফেসার রেগে গেলেন। “থেমে যায় না হাতি। এই বুদ্ধি নিয়ে তোরা বেঁচে আছিস।”

গোমেজ বলল, “বুদ্ধি না স্যার, বিদ্যে।”

তুমি থাম, গোমেজ, অকারণে তরঙ্গ তুলো না। তরঙ্গ থামে না।

অনন্তকাল ধরে দূর থেকে দূরান্তরে মহাশূন্যে কেবল এগিয়ে চলতেই থাকে। কোনো শব্দ থেমে যায় না। সেই আদ্যিকালে একটা বিকট বিস্ফোরণের ফলে সূর্যের গা থেকে পৃথিবীর গ্যাস ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল, তার শব্দও আজ পর্যন্ত মহাশূন্যের বুকে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে তো চলেইছে। কিচ্ছু থামে না। ডাইনোসরসের ক্যাঁওম্যাও, ম্যাস্টোডনের গর্জন, মহা-গিরগিটির খচমচ, তেমন ব্যবস্থা করতে পারলে, আজও শোনা যেতে পারে।”

আমরা তো তাই শুনে হাঁ!

প্রফেসার লজ্জিতভাবে হেসে বললেন, “আমি সে ব্যবস্থা করছি।”

আমরা আঁতকে উঠলাম। প্রফেসার বললেন, “গোমেজ, কান-ফুসফুস লাগাও।”

কোথা থেকে চারজোড়া ইয়ার-ফোন বের করে, গোমেজ নিজের ও আমাদের কানে লাগিয়ে দিল। প্রফেসার সুইচ টিপলেন। অমনি কানে আসতে লাগল অদ্ভুত সব শব্দ! যেন দূরে কিছুতে গর্জন করছে, কাছে কিসের প্রচণ্ড হাঁসফাঁস, মাঝখানে কান ফাটানো চ্যাঁ-চ্যাঁ। আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা। প্রফেসার ঝুঁকে পড়ে সুইচ বন্ধ করে বললেন, “আদিম মহাকায়দের দৈনন্দিন জীবনের কয়েক মিনিটের শব্দ শুনলে। এবার যা শুনবে সেটা ওর কয়েক লক্ষ বছর পরের শব্দ। গোমেজ, দুই নম্বর দাও।”

অমনি মনে হল কলকল, ছলছল, হুড়হুড়, হড়হড় করে প্রবল জলরাশি কূল ছাপিয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে গব-গব গবাস্ করে বড় বড় কি সব ডুবে যাচ্ছে। আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। কট্ করে প্রফেসার সুইচ বন্ধ করতেই ধড়ে প্রাণ এল।

প্রফেসার বললেন, “বাইবেলে যে মহাপ্লাবনের কথা আছে, এ হয়তো তারই শব্দ। এবার তিন নম্বর দাও, গোমেজ। এই জায়গাটাতে দশ হাজার বছর আগে কেমন শব্দ হত শুনুক এরা।”

সঙ্গে সঙ্গে কানে এল সড়সড়, খরখর, খুরখুর, খুটখুট, টকটক, কটকট, গুম গুম গুম, ধুপ ধুপ ধুপ—! প্রফেসার সুইচ টিপতেই সব

চুপ। প্রফেসার হেসে বললেন, "এখানকার আদি বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক শব্দ শুনলে। জলাভূমির গোসাপ, গিরগিটি, কচ্ছপ, কুমীরের চলাফেরা আর সেই পটভূমিকায় আদিম মানবের ঢোল পেটা ও তাণ্ডব নৃত্য।"

তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "অনেক রাত হয়েছে, গোমেজ তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক। আমার ঢের কাজ বাকি। তানসেন ধরতে হবে; বেহুলার নূপুরের ঝমঝম। আচ্ছা, তাহলে এসো।"

আমাদের মুখে কথা নেই। গোমেজ টর্চ জেলে দুজনকে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বের করে, নদীর উঁচু পাড়ের তলা দিয়ে হাঁটিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে দাদুর সামনে হাজির করল। "এই নিন, বড়বাবু, আগাগোড়া চোখে চোখে রেখেছি। কোনো অনিষ্ট করেনি। আচ্ছা চলি, স্যারের জন্য কচ্ছপের ডিমের অমলেট ভাজতে হবে।"

গোমেজ চলে গেলে, দাদু মুচকি হাসতে লাগলেন। একটুও বকলেন না। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল-বারের মতো গোঁফের ফাঁকে হেসে বললেন, "প্রাগ্-ঐতিহাসিক শব্দ শুনে বুঝি পিলে চমকেছে? ওতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সেকালে ঐ ধরনের আওয়াজ হওয়াই স্বাভাবিক। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে ঐ সমস্ত রোমাঞ্চকর শব্দ সবই এই সামান্য জিনিসটা দিয়ে তৈরি।"

এই বলে তাকের ওপর থেকে মাটির খোল বসানো একটা খেলনার একতারা আর তার বাঁশের ছড় নামিয়ে দেখালেন। আমদের চক্ষু ছানাবড়া।

"কে শব্দ তৈরি করল, দাদু?"

"কে আবার করবে, এই শর্মা ছাড়া? কার অত মাথাব্যথা ভাই বল? আমার মামা-বংশের শেষ উত্তরাধিকারীকে তো শব্দ-শব্দ করে ক্ষেপে যেতে দিতে পারি না। যেটুকু পারি শব্দ যোগাই। সারা বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স পড়ায়, ছুটি পেলেই এখানে এসে গবেষণা করে, নিজের পয়সাকড়ি, সময় সব ঢালে, সে-সব তো আর ব্যর্থ হতে দেওয়া

যায় না। তা ছাড়া যা চালাক, শীগগিরই এক দিন প্রাগ্-ঐতিহাসিক না হোক, নিদেন ঐতিহাসিক শব্দ ঠিক ধরে ফেলবে। তার আগে যাতে নিরাশ হয়ে ছেড়ে না দেয়, সেটুকু দেখা তো আমার কর্তব্য। তাই যা পারি খোরাক যোগাই। গোমেজের সাহায্যে। শুনবি নাকি ?"

এই বলে একতারাটা তুলে নিয়ে কখনো ছড় টেনে, কখনো ঢাকের মতো পিটিয়ে, কখনো তারে চিমটি দিয়ে, কখনো খোলের ওপর নখ দিয়ে আঁচড়ে, কখনো খাবলে, কখনো খামচে, কখনো খুঁটে, কখনো ঠুকে, কি শব্দ যে না বের করলেন তার ঠিক নেই। মনে হতে লাগল আদিম কালের কোনো জলাভূমির ধারে দাঁড়িয়ে অতিকায় সরীসৃপদের জীবনযাত্রার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। যে যেখানে ছিলাম হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম ; আর দাঁড়াতে পারলাম না।

তারপর একতারাটাকে আবার তাকে তুলে, দাদু বললেন, "কিন্তু তোদের না ওদিকে যেতে মানা করেছিলাম। শেষটা আমাকে ধরে ফেলে সব ফাঁস করে দিস্ আর কি ! গোমেজটার চোখ রাখার কথা ছিল, ব্যাটা করেটা কি ? অবিশ্যি যথেষ্ট হেল্পও করে। গবুর রেকর্ডারের সঙ্গে আমার গাছের ওপরের মাইক না হলে কে কনেক্ট করত শুনি ? তাছাড়া আমি যখন গাছে চড়ি, ও মই ধরে। এ-সব ঋণ শোধ করার নয়।"

আমি বললাম, "গবু কে, দাদু ?"

দাদু তো অবাক ! "সে কি, গবুকে জানিস না ? ঐ তো তোদের পাগলা বৈজ্ঞানিক, আমার মামাতো ভাই গবু। যা, খেয়েদেয়ে শো গে যা।"

———